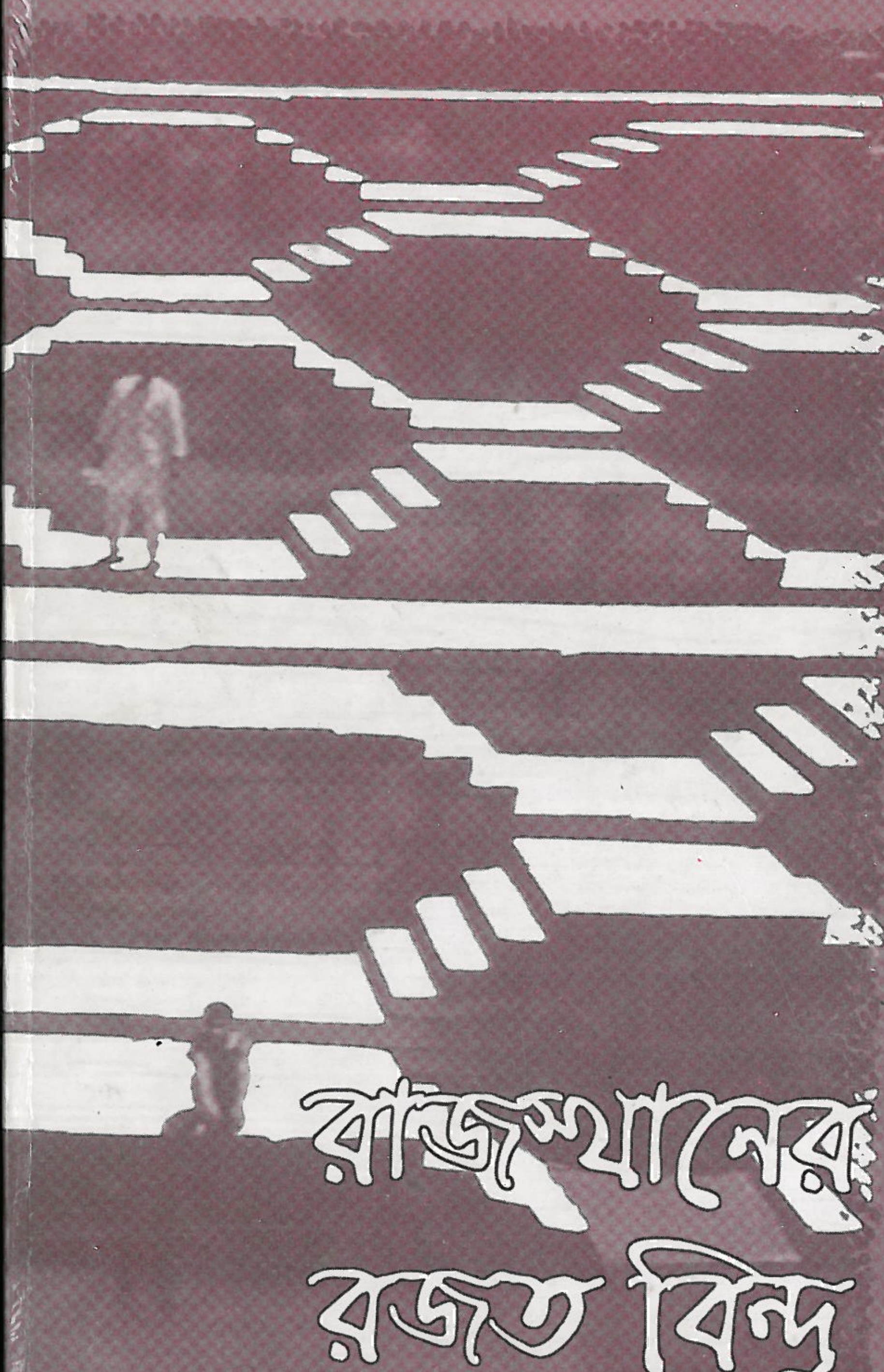

রাজস্থানের রজত বিন্দু

অনুপম মিশ্র

রাজস্থানের
রজত বিন্দু

অনুপম মিশ্র

অনুবাদ

নিরুপমা অধিকারী

আশাবরী

RAJSTHANER RAJAT BINDU

A Bengali Translation of RAJSTHAN KI RAJAT BUNDE

originally written in Hindi.

গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের পর্যাবরণকক্ষ কর্তৃক হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত বই 'রাজস্থান কী রজত বুঁদেঁ'-র বাংলা অনুবাদ।

গবেষণা ও সহযোগিতা : শীনা এবং মঞ্জুশ্রী

অলঙ্করণ ও রেখাচিত্র : দিলীপ চিঞ্চলকর

আলোকচিত্র : অনুপম মিশ্র

প্রচ্ছদ চিত্র : টোডা রায়সিংহের বাওয়ড়ি , টোঁক

আলেখ্য :অনুপম মিশ্র

গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান ,২২১-২২৩ দীন দয়াল উপাধ্যায় মার্গ , নতুন দিল্লি- ১১০০০২।

কথা : (০১১) ২৩২৩৭৪৯১ , ২৩২৩৭৪৯৩

অনুবাদ : নিরুপমা অধিকারী

আশাবরী, সুপার মার্কেট হাটতলা, পুরুলিয়া-৭৩২১০২ কথা :৯৪৭৪৫০৯৩২৩

বাংলায় প্রথম প্রকাশ : ১০। ২০০৩

প্রকাশক : ভারতীয় ভাষা পরিষদ.

দ্বিতীয় প্রকাশ : ২। ২০০৭

প্রকাশক : আশাবরী

মূল্য-৬০.০০টাকা (ষাট টাকা মাত্র)

দাদা

শ্রীধনপতি অধিকারীকে

গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানের নিরলস কর্মী হিন্দিতে লিখেছিলেন, "রাজস্থান কি রজত বুঁদে"— ১৯৯৫ সালে। ২০০৩ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদ এই বইটির একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিল। ভাষান্তরের দায় বহন করেছিলেন শ্রীমতী নিরুপমা অধিকারী। বর্তমান গ্রন্থটি সেই ভাষান্তরিত সংস্করণের পরিমার্জিত রূপ। রাজস্থান স্বল্প বৃষ্টির দেশ। বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ কোথাও ৫০০ মি.মি., কোথাও বা আরও অনেক কম। ১০০-৩০০ মিটার নীচে যে ভৌম জলস্তর রয়েছে তাও লবণাক্ত। গ্রীষ্মের দাবদাহে গোটা রাজস্থান জলের জন্য চাতক পাখির মত তৃষ্ণায় হাহাকার করে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও ওঁরা হার মানেন নি। কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ওঁরা গড়ে তুলেছেন জল সংরক্ষণের এক তুলনাহীন সংস্কৃতি। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা ওঁদের কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আর সেই জল সংরক্ষণের কত রকমের পদ্ধতি— কুণ্ড, বেরি, জোহর, তালাব, বাউড়ি, কুঁয়ো, কুঁই ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে জল সংরক্ষণের পদ্ধতিও বদলে যায়। তবে সব পদ্ধতিই মানুষের চিরায়ত অভিজ্ঞতা ও শ্রমদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। রাজস্থানের মানুষেরা বিশ্বাস করেন জলের জন্য শ্রমদান পুণ্যের কাজ।

পশ্চিমবঙ্গের কোথাও রাজস্থানের মত স্বল্প বৃষ্টি হয় না। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের তথাকথিত শুখা এলাকাতেও প্রায় ১৩০০-১৪০০ মি.মি. বৃষ্টি হয়। গত কয়েক দশকে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাওয়া বনাঞ্চল এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা জল সংকটের চিত্রটিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। হারিয়ে গেছে চিরায়ত জল সংরক্ষণ ও সেচের পদ্ধতিগুলি। বৃষ্টির প্রায় সব জলটুকু নদী-নালার পথ ধরে সাগরে চলে যায়। অথচ অনেক গাঁয়ের বধূই দুই বা তিন কি.মি. দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করেন।

নিরুপমা একটি জরুরী কাজ করলেন। এ কাজ সমাজ চেতনার, পুণ্যেরও বটে। রাজস্থান যদি পারে তবে রাঢ় বাংলাই বা পারবে না কেন? ভাষান্তরিত এই সংস্করণটি হয়ে উঠুক তৃষ্ণার্ত মানুষের হাতিয়ার।

কল্যাণ রুদ্র

কিছু কথা

(প্রথম সংস্করণে)

বসন্ত গোপ। জীবিকা, কুয়ো খোঁড়া। বসন্ত কখন থেকে কুয়ো খুঁড়ছে, বছরে বা সালে তার হিসেব জানে না সে। যে হিসেবটা ও দিয়ে থাকে সেটা এই রকম : 'প্রথম দিকে যে বাবুদের কুয়ো খুঁড়েছি তারা এখন প্রায় কেউই নেই, তাদের ছেলেরাও এখন অনেকেই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে।' এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে দেখছে- যে পাড়াতে আগে আঠারো/কুড়ি ফুট গভীরতায় জল পাওয়া যেত, এখন সেখানে নামতে হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ফুট। প্রথম দিকের খোঁড়া কুয়োগুলিও আবার ফিরে কুড়ি-বাইশ ফুট গভীর করতে হচ্ছে, কোন পাড়ায় তিরিশ বা চল্লিশ ফুটও। পুরুলিয়া জেলার ছোট্ট একটি গ্রামের এই দিনমজুরটি যে সত্য উপলব্ধি করেছে কয়েক বছর আগের থেকেই আজ সমস্ত দেশবাসী সেই সত্যের মুখোমুখি।

কিছু দিন আগে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী বিজয়া চক্রবর্তী রাজ্যসভায় জানিয়েছেন ১৯৮২ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য ও তার জেলাগুলিতে জলস্তর চার মিটারেরও বেশি নেমে গেছে। তিনি জানান গত কুড়ি বছরে উত্তর প্রদেশের ৩৯টি জেলা, রাজস্থানের-২৭টি, মধ্যপ্রদেশের-৩৩টি, মহারাষ্ট্রের-২৫টি, উড়িষ্যার-২১টি, গুজরাটের-১৮টি, অন্ধ্রপ্রদেশের-১৯টি, হরিয়ানার-১৬টি, কর্নাটকের-২১টি, তামিলনাড়ুর-১৮টি, পাঞ্জাবের-১১টি, পশ্চিমবঙ্গের-৮টি, ছত্রিশগড়ের-৮টি, দিল্লির-৬টি, কেরালার-৮টি, আসামের-৪টি, ঝাড়খন্ডের-৩টি, ত্রিপুরার-২টি, এবং বিহারের-১টি জেলায় জলস্তর চার মিটারেরও বেশি নেমে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে সল্টলেকে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ডের পক্ষে ২০০২ ছাব্বিশে এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, - গত পঁচিশ বছরে কলকাতায় পঁচাত্তোর থেকে নব্বই ফুট জলস্তর নেমে গেছে। তারা আরও বলেন, 'সেজন্য এখন থেকে সকলকে সতর্ক হতে হবে। যেমন খুশি মাটি থেকে জল তোলা হচ্ছে। তা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। পানীয় জল সরবরাহের অন্য কোন উপায় বার করতে হবে।'

ফিরে আবার বৃষ্টির জলের কথাই ভাবতে হবে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই কৃষি ও প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখার বিভিন্ন

পদ্ধতির প্রচলন ছিল। জলচক্রে বৃষ্টিই হচ্ছে প্রথম অবস্থা, তাই বৃষ্টিই হচ্ছে জলের মূল উৎস। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এই ঐতিহ্য ঔপনিবেশিক পর্বে ভাঙতে শুরু করে। তাই চেরাপুঞ্জিতে বছরে গড় পাঁচশো থেকে এক হাজার সেন্টিমিটার বৃষ্টির হওয়ার পর সেখানেও পানীয় জলের সঙ্কট রয়েছে। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জায়গাতেই যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি হয় কিন্তু তার প্রায় আশি ভাগই তিন মাসের মধ্যেই বর্ষিত হয়ে যায় এবং তা সংগ্রহ করে রাখার যথাযথ ব্যবস্থা না থাকার ফলে বয়ে চলে যায়। তাই বৃষ্টি হওয়াটাই বড় কথা নয়।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ প্রভৃতি যে জায়গাগুলি খরা প্রবণ বলে পরিচিতি পেয়েছে, সেগুলিরও যদি আমরা বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে এখানে যতটা পরিমাণ বৃষ্টি হয় তা যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে কৃষি বা গৃহস্থালি কোনো কাজেই জলের অভাব হওয়ার কথা নয়।

সরকার অবশ্য খরা সমস্যা সমাধানে বিরাট এক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। বলা হচ্ছে দেশের সব নদীকে খাল কেটে জুড়ে সেই জল পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের খরা এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন হয়ে নদী স্বাভাবিক যে গতিপথ দিয়ে বয়ে চলেছে তা ব্যহত হলে স্বাভাবিকতাও ব্যহত হবে এটা সাধারণ কথা কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্যে এর প্রভাব কতটা পড়বে? এই হস্তক্ষেপ আমাদের অস্তিত্বের মূলেই আঘাত হানতে চলেছে না তো? সরকার সমগ্র পরিকল্পনাটি জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট করুক। প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্যকলাপে মানুষ তার উন্নতিকল্পে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছে কিন্তু জল সমস্যায় আধুনিক প্রযুক্তি যে কাজে লাগছে না, বিগত দশকগুলিতে এটা আমরা সকলেই অনুভব করেছি। অথচ শুধু মাত্র বৃষ্টির জলকে পুরোপুরি ব্যবহার করে আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যা ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এরকম উদাহরণেরও অভাব নেই।

দীর্ঘ দিনের এই দেশীয় ঐতিহ্য ভাঙ্গতে শুরু করেছে ঠিকই, হয়তো অনেক জায়গায় নষ্টও হয়ে গেছে কিন্তু তবুও পুরোপুরি যে ভেঙ্গে পড়েনি 'রাজস্থানের রজত বিন্দু'ই তার প্রমান। শুধু তাই নয়, এই ঐতিহ্য যে কত উন্নত ও কত অনায়াস আত্মিক ছিল, কিভাবে তা ভাঙ্গতে শুরু করে, ভেঁঙ্গে পড়ার আগে ও পরের অবস্থা, স্বাধীনতার পর যে নতুন ধারা এল তাকেও কীভাবে সাহায্য করে চলেছে এই দেশীয় ব্যবস্থা তার বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন আনুপম মিশ্র তাঁর বই 'রাজস্থান কী রজত বুঁদে'-তে।

কোন একটি কাজ পূর্ণ হয়ে উঠতে সবসময়ই সহযোগিতা ও সাহায্যের প্রয়োজন হয় অনেকের। এক্ষেত্রেও অনেকেরই সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েই কাজটি পূর্ণ হতে পেরেছে। তবুও কিছু জনের কথা বলতেই হয়। এক্ষেত্রে প্রথম নামটি হল সুরজিৎ সুলেখাপুত্র। সুরজিৎ-এর অনেকরকম সহযোগিতা রয়েছে এই বইটিতে। কিছু শব্দের অর্থের জন্য অনুপমজির-ই স্মরণাপন্ন হতে হয়। তিনি যত্ন সহকারে বিস্তারিতভাবে সেই শব্দগুলির অর্থ আমাদের বুঝিয়েছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে সেগুলিও দেওয়া হল। এছাড়াও এই একই কারণে আরও কিছু শব্দের অর্থও দেওয়া হয়েছে। শ্যামদার কথাটা শুধু নামেই শেষ করতে হল, অবশ্য এতেও তাঁর আপত্তি ছিল। পরিশেষে বলতে হয় কুসুম খেমানিজির কথা যিনি ভারতীয় ভাষা পরিষদরের পক্ষ থেকে বইটি বাংলায় প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এসব কিছুর পরও বইটি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না যদি না শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ঠিক সময়টিতে তাঁর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বানানের ক্ষেত্রে আমরা আকাদেমি নিয়মবিধি-ই মানার চেষ্টা করেছি তবে যেক্ষেত্রে কোনো শব্দ বা বাক্য মূল বই থেকে সরাসরি নেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে মূল বইয়ের বানানই রাখা হয়েছে।

আরও একটি কথা বলে নিতে হয় - বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম 'পাধারো মাহ্‌রে দেশ'—পধারো কথাটির সাধারণ অর্থ আসুন। তবে পধারো শব্দটিতে যে শ্রদ্ধা ও আদরের ব্যাঞ্জনা রয়েছে, আসুন শব্দটিতে তা ধরা পড়ে না। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এই রকম কোন শব্দ খুজে পেলাম না যাতে পধারোর ব্যাঞ্জনাটুকু ধরা পড়ে। সম্ভবত হিন্দির ক্ষেত্রেও এই অসুবিধা ছিল; তাই মূল হিন্দি বইয়েও এই রাজস্থানি বাক্যটিই রেখে দেওয়া হয়েছে। আমিও তাই করলাম।

নিরুপমা অধিকারী

আবার এলাম

যে কোনো বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়া মানেই মনের মধ্যে বেশ কতকগুলি ভাবনাকে উসকে দেওয়া। এর মধ্যে প্রথম যে ধারনাটি মনের মধ্যে উঁকি দেয় তা হল বইটি সম্বন্ধে জনমানুষের আগ্রহ। দ্বিধাহীনভাবে একথা স্বীকার করে নিতেই হয় যে বইটি তার বিষয়বস্তুর জন্য সে অহংকারে অহংকারী হতেই পারে। আসলে আজকের তীব্র জলসংকটের মুখে যখন প্রতিটি রাজ্য, প্রদেশ ও জেলা জর্জরিত তখন বইটি আমাদের সামনে এক নতুন দীগন্তের উন্মোচন করে। জল নিয়ে ভাবনা আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বে এক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। এই আন্দোলন রচনা করতে চলেছে এক ইতিহাস। যে ইতিহাস বড়ই দুঃখের। এ ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে, আগামী শতাব্দীর কাছে শুধু লজ্জিতই নয় অপরাধী থাকার ইতিহাস।

২০০৬-এর বিশ্বপিরেবশ দিবসের থিম "Deserts and Desertification" যার স্লোগান হল "Don't Deserts Drylands". "রাজস্থানের রজত বিন্দু " কিন্তু আমাদের শোনায় মরুভূমিতে সজলতার কথা।

জল সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা বা কথাবার্তায় ইদানিং আরও একটি শব্দ ঘুরে ফিরে আসছে "Sustainable" এই শব্দটির যথার্থ অর্থ ব্যক্ত হয়েছে অনুপমজীর "রাজস্থান কী রজত বুঁদে" বইটিতে।

বর্তমানে আরও একটি কথা আমাদের চিন্তানায়কদের মুখে, আমাদের পরিকল্পনা রচনাকারীদের মুখে শোনা যাচ্ছে- "ভারতবর্ষের বেশীরভাগ মানুষই মনে করে জল হচ্ছে প্রকৃতির দান এবং তা বিনা মূল্যে পাওয়া যায়।" সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও আমাদের সকলের জানা, যে রাজস্থানে এক এক বিন্দু জল রজত বিন্দুর মতোই দামী, কিন্তু রাজস্থানের মানুষ, রাজস্থানের সমাজ, তার মূল্য কিভাবে নির্ধারন করেছে? একটি উদাহরন নেওয়া যাক্— রাজস্থানে ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন, দুরকম কুণ্ডই দেখা যায়। ব্যক্তিগত হলে এগুলি ঘরের সামনে, উঠোনে, হাতায়, পিছনে ও বেড়ার পাশে থাকে। আর সর্বজনীন কুণ্ড সাধারণত পঞ্চায়েতের খাস

জমিতে অথবা দুটো গ্রামের মাঝখানেই হয়। সর্বজনীন কুণ্ড গ্রামের মানুষই তৈরি করে। জলের জন্য শ্রমদান পুণ্যের কাজ। কোনো পরিবার বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে প্রায়ই সর্বজনীন কুণ্ড নির্মাণের সংকল্প নেয়। তবে তার বাস্তব রূপায়ণে গ্রামের সব মানুষই সহযোগিতা করে। কখনো কখনো কোনো সম্পন্ন পরিবার সর্বজনীন কুণ্ড তৈরি করে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অন্য কোনো পরিবারের হাতে তুলে দেয়। কুণ্ডের বড় হাতার মধ্যে আগৌরের বাইরে এই পরিবারের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়। এই ব্যবস্থা দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। কুণ্ড নির্মাতা সচ্ছল গৃহকর্তা সম্পত্তির একটা অংশ কুণ্ড দেখাশোনা করার জন্য আলাদা করে রেখে দেয়; এবং এই ব্যবস্থা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চলতে থাকে। এখনও রাজস্থানে এমন অনেক কুণ্ড আছে যেগুলো তৈরি করিয়েছে যে পরিবার, তারা হয়তো ব্যবসা অথবা চাকরির খাতিরে এখন আসাম, বাংলা বা মুম্বাইতে প্রবাসী, অথচ এগুলি দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল যে পরিবারের ওপর— তারা এখনও কুণ্ডতেই বসবাস করছে। এই বড় বড় কুণ্ডগুলি আজও বর্ষার জল সঞ্চয় করে রাখে এবং যে কোন পৌরসভার সরবরাহ করা জলের চেয়ে শুদ্ধ ও নির্মল জল, সারা বছর জোগান দিয়ে যেতে সক্ষম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনুপমজীর এই বইটি কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়, সমাজের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। বইটি রচনা করে অনুপমজী আমাদের প্রজন্মের অপরাধ লাঘব করেছেন আমাদের উত্তর প্রজন্মের কাছে। বইটির আনুবাদ করে আমি তাঁর সেই মহৎ প্রচেষ্টাকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেরছি মাত্র।

আমার এই কাজে, ***আজও পুকুর আমাদের*** বই-য়ের মতোই যিনি এবারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি আর কেউ নন, পরিবেশ সচেতক উদার হৃদয়, শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য, আর যাঁর নামটি না করেল অপরাধ করা হয় সে নামটি হল শ্রীশ্যাম আবিনাশ। আর একজন যে আমার সমস্ত কাজের সাহায্যকারী সে আমার পাশে না থাকেল হয়তো এ কাজটাই সম্ভব হতো না সে আমার ছোট ভাই সঞ্জয় অধিকারী। দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শ্রীপ্রতাপ মিত্রের কাছে। প্রুফ দেখে বইটিকে নির্ভুল করতে সাহায্য করায় হার্দিক অভিনন্দন রইল বান্ধবী সীমা সাহা পোদ্দার-কে এবং আমার আরও এক ভাই অভিজৎ মাজি-কে।

নিরুপমা অধিকারী

পধারো মাহ্‌রে দেশ...	১
মাটি, জল ও তাপের তপস্যা...	৬
রাজস্থানের রজত বিন্দু...	১৬
থেমে থাকা জল নির্মল...	২৬
বিন্দুতে সিন্ধু...	৩৬
জল ও অন্নের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক...	৫৩
'ভুনের' বারোমাস...	৫৭
স্বাবলম্বী সমাজ...	৬৮
তথ্য সূত্র...	৭৫
শব্দার্থ...	৯৭

বলা হয়ে থাকে ...

মরুভূমির জনসমাজকে
শ্রীকৃষ্ণ বর দিয়েছিলেন
যে, এখানে জলের অভাব
হবে না।
গল্পটা মহাভারতের যুদ্ধ
শেষ হওয়ার সময়ের।
কিন্তু মরুভূমির জনসমাজ
এই বর পেয়ে হাতে হাত
দিয়ে বসে থাকেনি। তারা জল সংগ্রহের
ব্যাপারে নিজেদের বিভিন্ন ভাবে
সংগঠিত করে। গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে
বর্ষার জল ধরে রাখার
রীতি খোঁজে এবং জায়গায় জায়গায় তা
তৈরি করার এক ভীষণই ব্যবহারিক,
ব্যবস্থাসম্মত ও বিশাল সংগঠন খাড়া
করে। এতই বিশাল যে পুরো সমাজ
তাতে এক প্রাণ হয়ে যায়। এর আকার
এতই বড় যে সত্যিই তা নিরাকার
হয়ে যায়।
ভগবানের বরকে আদেশের মতই
শিরধার্য করে
মরুভূমির জনসমাজ।

পধারো মাহ্‌রে দেশ

অতীতে কখনও এখানে সমুদ্র ছিল। ঢেউ-এর পরে ঢেউ উঠত। কালের ঢেউয়ে না জানি কেন ও কীভাবে সেই অথৈ সমুদ্র শুকিয়ে গেছে। আজ এখানে চতুর্দিকে বালির সমুদ্র। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এখনও ওঠে।

প্রকৃতির এক বিশাল রূপকে অন্য আরেক বিশাল রূপে— সমুদ্র থেকে মরুভূমিতে বদলাতে হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে। এই নতুন রূপের পরিণতিও হয়তো হাজার হাজার বছর হয়ে গেল, কিন্তু রাজস্থানের সমাজ সেই প্রথম রূপটিকে আজও ভোলেনি। তারা নিজেদের মনের গভীরে আজও তাকে 'হাকড়ো' নামে স্মরণে রেখেছে। প্রায় হাজার বছরের পুরোনো ডিঙ্গল ভাষায় এবং আজকের রাজস্থানিতেও এই হাকড়ো শব্দ সেই প্রজন্মের ঢেউয়ে ভেসে বেড়ায়, যাদের পূর্বপুরুষেরাও কখনও সমুদ্র দেখেনি[১]।

বর্তমান মারওয়াড়ের পশ্চিমে লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রচলিত হাকড়ো শব্দ ছাড়াও রাজস্থানের হৃদয়ে সমুদ্রের আরও অনেক নাম রয়েছে। সংস্কৃত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সিন্ধু, সরিতাপতি, সাগর, ওয়ারাধিপ— এর মতো শব্দ তো রয়েইছে, এছাড়াও অচ, ওঅহ, দেধান, ওডনীর, ওয়ারহর, সফরা-ভাণ্ডার প্রভৃতির মতো সম্বোধনও পাওয়া যায়। আরও একটি নাম হল 'হেল'। এই হেল শব্দটিতে সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে উদারতা ও বিশালতাকেও বোঝানো হয়েছে।

এটা রাজস্থানেরই উদারতা বলতে হবে যে এই বিশাল মরুভূমিতে থেকেও তাদের কণ্ঠে সমুদ্রের এত নাম পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটিও নিশ্চয় বড়ই বিচিত্র ছিল! বিশ্বে যে ঘটনাটি ঘটেছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে, যা ঘটতেও হয়তো লেগেছে হাজার হাজার বছর, সে সবের যদি কেউ হিসেব করতে বসে তাহলে পরিসংখ্যানের অনন্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া কীই বা হতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ কোটি মাইলের দূরত্বকে আলোকবর্ষ দিয়ে মেপে থাকেন, কিন্তু রাজস্থানের মানুষ

তো দীর্ঘ-দিনের এই এত এত কঠিন গুণ-ভাগ চোখের পলকেই করে ফেলেছে। এই বিরাট ঘটনাকে তারা 'পলক-দরিয়ার' শব্দের মধ্য দিয়ে মনে রেখেছে। পলক ফেলতেই সমুদ্রের শুকিয়ে যাওয়া এবং ভবিষ্যতে ক্ষণিকের মধ্যেই আবার সেই শুষ্ক স্থান সমুদ্রে পরিণত হওয়ার ব্যাঞ্জনা এই শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এই যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যা সময়ের অন্তহীন প্রবাহকে এক একটি খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে অনুভব করতে পারে; বিরাটত্ব ও বিশালতাকে একটি কণায় নিহিত বলে ভাবতে পারে - সেই দৃষ্টিভঙ্গি হাকড়োকে হারিয়ে ফেলেছে। তবে হাকড়োকে হারিয়ে ফেললেও তার জলের বিশালতাকে এক একটি কণা, এক একটি বিন্দুর মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই সমাজ নিজেদের এমন কিছু রীতিতে ঢেলে সাজিয়েছে যে, অখণ্ড সমুদ্র যেন খণ্ড-খণ্ড হয়ে ঠাঁই-ঠাঁই অর্থাৎ জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে দেশের যোজনা কমিশন পর্যন্ত রাজস্থানের, বিশেষ করে মরুভূমির যে ছবি দেখানো হয়েছে তা এক শুষ্ক, জনহীন ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের। থর মরুভূমির বর্ণনা তো এমনভাবে করা হয়েছে যে ভয়ে বুক শুকিয়ে আসে। শুধুমাত্র যদি মধ্যপ্রদেশকে বাদ দেওয়া যায় তাহলে ক্ষেত্রফলের বিচারে দেশের সমস্ত রাজ্যর মধ্যে দ্বিতীয় বড় রাজ্য হল রাজস্থান (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পর রাজস্থানই দেশের সব চেয়ে বড় রাজ্য)। জনসংখ্যার হিসেবে নবম স্থানে রয়েছে রাজস্থান; কিন্তু ভূগোলের সব বইয়ে-ই বর্ষার ক্ষেত্রে তার স্থান সকলের শেষে।

পুরোনো পদ্ধতি অনুযায়ী ইঞ্চিতে বা নতুন পদ্ধতি মতো সেন্টিমিটারে মাপা হোক, বর্ষা এখানে সব থেকে কম। সারা বছরে গড় বৃষ্টিপাত ষাট সেন্টিমিটার। দেশের গড় বৃষ্টিপাত মাপা হয়েছে একশো দশ সেন্টিমিটার। এই হিসেব অনুসারেও রাজস্থানের বর্ষা ঠিক অর্ধেক-ই দাঁড়ায়। কিন্তু এই যে পরিসংখ্যান যেগুলো গড়ের হিসেব দিচ্ছে– সেগুলোও এখানকার সঠিক চিত্র দিতে পারে না। রাজ্যের ও প্রান্ত থেকে এ প্রান্ত কখনোই একই পরিমাণে বৃষ্টি হয় না। কোথাও তা একশো সেন্টিমিটারের বেশি তো কোথাও পঁচিশ সেন্টিমিটারেরও কম।

ভূগোল বইগুলো এই অঞ্চলের বর্ষাকে ও প্রকৃতিকে এক অতি কৃপণ মহাজনের মতো চিত্রিত করেছে। আর রাজ্যের পশ্চিম অংশকে দেখিয়েছে এই মহাজনের সব থেকে নির্দয় শিকার হিসেবে। এই অঞ্চলেই পড়ে জয়সলমের, বিকানের, চুরু, যোধপুর ও শ্রীগঙ্গানগর। এখানে আবার কার্পণ্যের ভিতরেও কার্পণ্য দেখা যায়।

অর্থাৎ এককথায়— বর্ষার বিতরণ ভীষণই অসমান। রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে যেতে বর্ষা ক্রমশই কমতে থাকে। পশ্চিমে এসে তা সূর্যের মতোই ক্রমেই অস্তগামী হয় এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে মাত্র ষোলো সেন্টিমিটার বৃষ্টিই সে দিতে পারে। এই পরিমাণের তুলনা করুন দিল্লির সঙ্গে, একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটারেরও বেশি বৃষ্টিপাত হয় সেখানে। তুলনা করুন গোয়ার সঙ্গে এবং চেরাপুঞ্জি বা কোঙ্কনের সঙ্গে, যেখানে এই পরিমাণটা পাঁচশো থেকে হাজার সেন্টিমিটার পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়।

মরুভূমিতে সূর্যই বর্ষিত হয় গোয়া, চেরাপুঞ্জি বৃষ্টির মতো। জল কম, গরম বেশি— এই দুটো বিষয় যেখানে এক হয়ে যায় সেখানে তো জীবন সঙ্কটময় হয়ে ওঠার কথা, অন্তত সেরকমই মনে করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মরুভূমিতেও এরকমই গরম পড়ে, এই পরিমাণ-ই বৃষ্টি হয়। তাই সেখানে বসতিও খুব কমই গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাজস্থানের মরুভূমিতে পৃথিবীর অনান্য মরুভূমির তুলনায় বসতি শুধু বেশিই নয়, সেই বসবাসে জীবনের সুগন্ধও রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য মরুভূমির তুলনায় এই ক্ষেত্রটি অনেক অনেক জীবন্ত।

এর রহস্য লুকনো রয়েছে এখানকার সমাজে। জলের স্বল্পতার কান্না কখনও কাঁদেনি রাজস্থানের সমাজ। এই সমস্যাটিকে তারা চ্যালেঞ্জের মতো করে গ্রহণ করেছে এবং এই চ্যালেঞ্জের উত্তরে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত নিজেদের এমনভাবে প্রস্তুত করেছে যে এখানে জলের স্বভাব সমাজের স্বভাবের থেকেও সরল ও তরলভাবে বয়ে যেতে সক্ষম।

এই বহতা স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত না হলে কখনোই বোঝা যাবে না যে, এখানে বিগত এক হ।জার বছর ধরে জয়সলমের, যোধপুর, বিকানের ও জয়পুরের মতো বড় শহরও কীভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে। আর এই বেড়ে ওঠা যেমন তেমন ভাবে নয় যথেষ্ট ভদ্রভাবে। এই শহরগুলির জনসংখ্যা কিছু কম ছিল না। এত কম বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এসব শহরের জীবনযাত্রা দেশের অন্য কোনো শহরের তুলনায় কম সুবিধাজনকও ছিল না। এই শহরগুলির প্রতিটিই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শক্তি, সামর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পে বিশিষ্ট কেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়েছে। যখন মুম্বাই, কলকাতা বা মাদ্রাজের মতো বর্তমান সময়ের বড়-বড় শহরগুলির ভূমিকা পর্যন্ত রচিত হয়নি তখনই জয়সলমের আজকের ইরান আফগানিস্থানের থেকে শুরু করে রাশিয়ার কোনো কোনো অংশ পর্যন্ত বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

রাজস্থানের সমাজ নিজেদের জীবনদর্শনের গভীরতা দিয়েই স্পর্শ করেছে জীবনের,

শিল্পের, বাণিজ্যের ও সংস্কৃতির এক উচ্চ সীমা। এই জীবনদর্শনে জলসংগ্রহের কাজ এক বড় ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। ওই ঐতিহ্যকে অবশ্যই কিছুটা বিনষ্ট করেছে বর্তমান যুগের অপূর্ণ বিকাশের তথাকথিত আধুনিক অগ্রগতি। তবে পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলতে পারেনি।

এখানে জলসংগ্রহের কাজে ভাগ্য ও কর্তব্য - দুইই রয়েছে । একে তো ভাগ্যই বলতে হবে— মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পর শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র থেকে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে এই রাস্তা দিয়েই দ্বারকায় ফিরছিলেন । তাঁদের রথ চলেছিল মরুভূমির ওপর দিয়ে। বর্তমান জয়সলমেরের কাছে এসে তাঁরা দেখেন উত্তুঙ্গ ঋষি তপস্যা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে প্রণাম করে বলেন যে তিনি তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছেন তাই উত্তুঙ্গ ঋষিকে তিনি বর দিতে চান। উত্তুঙ্গ শব্দের অর্থ উঁচু। ঋষি সত্য-সত্যই অনেক বড় মনের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই চাইলেন না। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্যও থেকে থাকে, তাহলে হে ভগবান, বর দিন যেন এই এলাকায় জলের অভাব না থাকে'।

ভগবান বর দিয়েছিলেন, 'তথাস্তু'।

মরুভূমির ভাগ্যবান সমাজ কিন্তু এই বর পেয়েই হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। জল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজে নিজেদের নিয়োগ করে। গ্রামে-গ্রামে, স্থানে-স্থানে বর্ষার জলকে ধরে রাখার রীতি তৈরি হয় এইভাবে ।

এখানে রীতির একটি পুরোনো প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, 'ওয়জ'। ওয়জ শব্দটি রচনা, যুক্তি এবং উপায়ের অর্থে তো ব্যবহার হয়ই, তাছাড়াও সামর্থ, বিবেক ও বিনম্রতা বোঝাতেও এই শব্দের প্রয়োগ হয়ে এসেছে । বর্ষার প্রতিটি বিন্দুকে সংগ্রহ করার ওয়জ হয়ে এসেছে বিবেকের সঙ্গে এবং বিনম্রতা সহকারে ।

এখানের সমাজ বৃষ্টিকে ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে নয়, এমনকী আঙুল বা বিত্তাতেও নয়, সম্ভবত বিন্দুতে বিন্দুতে মেপেছিল। তারা জলবিন্দুগুলিকে রুপোর বিন্দুর মতো দেখেছে এবং খুবই সহজভাবে ওয়জ-এর সঙ্গে এই তরল বিন্দুগুলিকে সংগ্রহ করে নিজেদের জলের প্রয়োজন মেটাবার এমন এক বিরাট ঐতিহ্য তৈরি করেছে। যার স্বচ্ছ ধারা ইতিহাস থেকে বেরিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত বয়ে চলেছে এবং বর্তমানকেও ইতিহাসে পরিণত করার 'ওয়জ' অর্থাৎ সামর্থ্য রাখে।

রাজস্থানের পুরোনো ইতিহাসে মরুভূমি বা কাছাকাছি অন্যান্য স্থানেরও যা বর্ণনা পাওয়া যায়, তা কখনই শুষ্ক, জনহীন বা অভিশপ্ত নয়। মরুভূমির জন্য বর্তমানে প্রচলিত শব্দ 'থর'-ও খুব একটা পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষ হয়েছে ঠিকই,

কোথাও কোথাও জলের কষ্টও ছিল, কিন্তু গৃহস্থ থেকে শুরু করে সন্ন্যাসী কবি থেকে মাঙ্গাণিয়ার বা লাঙ্গারা[২]; এছাড়াও হিন্দু-মুসলমানেরা সকলেই একে 'ধরতি ধোরা রি[৩] বলেছে। মরুভূমির পুরোনো নামে 'স্থল' পাওয়া যায়। যা সম্ভবত হাকড়ো অর্থাৎ সমুদ্র শুকিয়ে গেলে যে স্থলের উৎপত্তি হয় তারই ইঙ্গিত। এবার স্থল হল থল এবং তার থেকে মহাথল। আবার মুখের ভাষায় থল হল থলি এবং ধরধুধল। থলি তো একটা মোটা দাগের পরিচিতি রূপেই রয়েছে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর বিচারে তা বিভিন্ন স্থানে আলাদা আলাদা নামে পাওয়া যায়। মাড়, মারওয়াড়, মেওয়াড়, মেরওয়াড়, দুঁদার, গোডওয়াড়, হাড়ৌতি-র মতো বড় বিভাজন আবার দসরেক এবং ধন্বদেশ-এর মতো ছোট বিভাজনও ছিল। আর এই বিরাট মরুস্থলে ছোট বড় যত রাজাই থাকুক, নায়ক তো একজনই, শ্রীকৃষ্ণ। এখানে তাঁকে খুবই স্নেহের সঙ্গে মরুনায়কজি বলে ডাকা হয়।

মরুনায়কজির বরদান এবং সমাজের নায়কদের ওয়জ, সামর্থ্যের এক অভূতপূর্ব সংযোগ তৈরি করে। এই সংযোগ থেকেই ওয়জতো-ওজতো অর্থাৎ প্রত্যেকে গ্রহণ করতে পারে এই রকম সরল ও সুন্দর এক রীতির জন্ম হয়েছে। নীচে ধরিত্রীর উপর দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা অতীত যুগের হাকড়ো ওপরের আকাশে যেন মেঘ হয়ে উড়তে থাকে। এই মেঘের পরিমাণ হয়তো কমই, কিন্তু মানুষ মেঘের মধ্যস্থিত ওই জলকে ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে না দেখে অগণিত বিন্দু রূপে দেখেছে ও একে মরুভূমিতে তথা সারা রাজস্থানে ঠিক বিন্দুর মতোই ছড়িয়ে থাকা টাঁকা, কুণ্ড-কুণ্ডি, বেরি, জোহড়, নাড়ি, তালাব, বাউড়ি কুয়ো, কুঁই এবং পার গুলিতে ভরে নিয়ে উড়ে চলা সমুদ্রকে অথবা অখণ্ড হাকড়োকে যেন খণ্ডে-খণ্ডে নীচে নামিয়ে এনেছে ।

যশঢোল অর্থাৎ প্রশংসা করা। রাজস্থান নিজেদের অপূর্ব জলসংগ্রহের এই ঐতিহ্য নিয়ে তথাকথিত যশের ঢোল কোনোদিন বাজায়নি। আজ দেশের প্রায় সব ছোট-বড়, শহর-গ্রাম, বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী এমনকী আমাদের দেশের রাজধানীও যথেষ্ট বর্ষা হওয়া সত্ত্বেও জলের জোগান দিতে সম্পূর্ণ অসফল হয়েছে বলা যায়। দেশের জল সরবরাহের ব্যাপারে এই অসফলতা, বধিরতা নিয়ে আসার আগেই শুষ্ক নামে পরিচিতি পাওয়া রাজস্থানের মরুভূমির জলসংগ্রহের যে পরিপূর্ণ বৃহৎ ঐতিহ্য রয়েছে তার ঢাকঢোল বাজানোই উচিত।

পধারো মাহ্‌রে দেশ।

মাটি জল ও তাপের তপস্যা

মরুভূমিতে মেঘের এক টুকরো হালকা রেখা দেখা গিয়েছে কী যায়নি ছোটদের দল একটা বড় চাদর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আটটি ছোট ছোট হাত চাদরটাকে চার কোণায় মেলে ধরে থাকে। এবার দলটা ঘরে ঘরে যাবে সঙ্গে চলবে গান–

ডেডরিয়ো করে ডরুঁ, ডরুঁ
পালর পানি ভরুঁ ভরুঁ
আধি রাত রি তলাই নেষ্টেই নেষ্টে...

প্রতিটি ঘর থেকেই চাদরে এক মুঠো করে গম দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও বাজরার আটাও। পুরো পাড়া পরিক্রমা হতে হতে চাদরের ওজন বাড়তে থাকে এবং ছোট ছোট আটটি হাত এই ওজন তুলতে যথেষ্ট মনে হয় না। চাদর গুটিয়ে নেওয়া হয়। এবার এই দলটা কোথাও একটা জমা হবে। আনাজ সেদ্ধ করে তৈরি হবে গুগরি[১]। কণা কণা সংগ্রহ এইভাবে বাচ্চাদের তৃপ্ত করে ।

এবার বড়দের পালা— বিন্দু বিন্দু করে জল সংগ্রহ করে সারা বছর ধরে তৃপ্ত থাকার। কিন্তু রাজস্থানের জল সংগ্রহের ঐতিহ্যটিকে বোঝার আগে এই জায়গাটার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

কমপক্ষে জলের ব্যাপারে রাজস্থানের কুণ্ডলী শুভ। নিজেদের প্রচেষ্টা ও কৌশলে এটিকে মঙ্গলময় করে তোলা অবশ্য খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। কাজটা অবশ্যই কঠিন, আবার জায়গার বিস্তৃতিটাও কম নয়। ক্ষেত্রফলের হিসেবে বর্তমান রাজস্থান দেশের সব থেকে বড় রাজ্য। দেশের ক্ষেত্রফলের শতকরা এগারো ভাগ, প্রায় ৩.৪২.২১৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এর বিস্তৃতি। এই হিসেব অনুযায়ী বলা যায়, পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনাতেই ক্ষেত্রফলে বড় আমাদের এই রাজ্য। ইংল্যান্ডের থেকে তো দ্বিগুণই বলা যায়।

প্রথমে ছোট বড় মিলিয়ে একুশটা রিয়াসত ছিল, এখন একত্রিশটা জেলা। এর মধ্যে তেরোটা জেলা রয়েছে আরাবল্লী পর্বতমালার পশ্চিমে আর বাকিগুলো পূর্বে। পশ্চিম ভাগের তেরোটি জেলার নাম হল : জয়সলমের, বাড়মের, বিকানের, যোধপুর, জালৌর, পালি, নাগৌর, চুরু, শ্রীগঙ্গানগর, সিকর, হনুমানগড়, সিরোহি ও ঝুঁঝনু। পূর্বে ও দক্ষিণে পড়ে— বাঁসওয়াড়া, ডুঙ্গারপুর, উদয়পুর, কাঁকরোলি চিতোরগড়, ভিলওয়াড়া, ঝালওয়াড়, কোটা, বারাঁ, বুঁদি, টোঁকা, সওয়াইমাধোপুর, ধৌলপুর, দৌসা, জয়পুর, অজমের, ভরতপুর ও অলওর জেলা। এই রাজ্যের সব থেকে বড় জেলা হল জয়সলমের। জয়সলমেরে বিস্তৃতি প্রায় ৩৮.৪০০ বর্গ কিলোমিটার। সব থেকে ছোট জেলা হল ধোলপুর যা জয়সলমেরের দশ ভাগের এক ভাগ।

বর্তমান ভৌগোলিকেরা এই পুরো এলাকাটিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। মরুভূমিকে বলা হয় পশ্চিমের বালুকাময় ময়দান বা শুষ্ক ক্ষেত্র। এর সঙ্গে লাগোয়া অঞ্চলকে বলা হয় অর্ধশুষ্ক ক্ষেত্র। যার পুরোনো নাম ছিল 'বাগড়'। এছাড়া রয়েছে আরাবল্লী পর্বতমালা এবং মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির সঙ্গে লাগোয়া রাজ্যের সংশ্লিষ্ট ভাগকে বলা হয় দক্ষিণ পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চল। এই যে চারটি ভাগ, এর মধ্যে সব থেকে বড় অংশ হল পশ্চিমের বালুকাময় ময়দান বা মরুভূমি। যার পূর্ব প্রান্ত গিয়ে ঠেকেছে উদয়পুরের কাছে, উত্তর প্রান্ত পাঞ্জাব ছুঁয়ে যায়, দক্ষিণ প্রান্ত গুজরাত এবং পশ্চিমের সমস্ত অংশটিই জুড়ে রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে।

মরুভূমি অবশ্য পুরোটাই মরুময় নয়; কিন্তু যতটা রয়েছে সেটাও কিছু কম নয়। এর মধ্যে পড়ে জয়সলমের, বাড়মের, বিকানের, নাগৌর, চুরু ও শ্রীগঙ্গানগর জেলা। এখানেই রয়েছে বালির বড় বড় টিলা, যাকে স্থানীয় কথায় বলা হয় 'ধোরে'। গরমের দিনে তীব্র ঝড়ে বলির টিলাগুলো যেন পাখা মেলে এদিক থেকে ওদিকে উড়ে বেড়ায়[২]। তখন অনেকবারই রেললাইন, ছোট-বড় রাস্তা বা জাতীয় সড়কও বলির তলায় চাপা পড়ে যায়। এই অংশেই বর্ষা সব থেকে কম। ভৌমজল

প্রচুর নীচে; প্রায় একশো থেকে তিনশো মিটার তাও আবার বেশিরভাগই নোনতা।

যে অংশটাকে অর্ধশুষ্ক বলা হয় তা বিশাল মরুভূমি ও আরাবল্লী পর্বতমালার মাঝে উত্তর পূর্ব থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে লম্বালম্বি বিস্তৃত রয়েছে। এখান থেকেই বর্ষা কিছুটা বাড়তে থাকে। তবুও সে পরিমাণটা পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ সেন্টিমিটারের মধ্যেই ঘোরা-ফেরা করে। আর এই পরিমাণটা দেশের গড় বৃষ্টিপাতের অর্ধেকেই দাঁড়ায়। অর্ধশুষ্ক অঞ্চলের কোথাও কোথাও দোয়াঁশ মাটি দেখতে পাওয়া গেলেও বাকি সমস্ত জায়গায় সেই চিরপরিচিত বালি। মরুভূমির প্রসার আটকানোর সমস্ত রকম রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের পরিকল্পনাগুলিকে[৩] বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মরুঝড় আরাবল্লীর 'দরো'[৪] থেকে বালি তুলে নিয়ে গিয়ে পূর্বদিকে ফেলে। এই ছোট ছোট দরোগুলো রয়েছে ব্যাবর, অজমের ও সিকরের কাছেই।

অর্ধশুষ্ক অঞ্চলেই রয়েছে ব্যাবর, অজমের, সিকর ও ঝুঁঝনু জেলা এবং বিপরীত দিকে নানৌর, যোধপুর, পালি, জালৌর ও চুরুর কিছু অংশ। ভৌমজলের গভীরতা এখানেও একশো থেকে তিনশো মিটার এবং স্বাদেও নোনতা।

এই অঞ্চলগুলির জল তো নোনতা বটেই, কিছু অংশে আরও এক বিচিত্র পরিস্থিতি দেখা যায়— মাটিও নোনতা। এরকম নোনা জায়গার নিচু ভাগে নোনতা জলের ঝিল দেখতে পাওয়া যায়। সাম্ভর, ডেগানা, ডিডওয়ানা, পচপদরা, লুনকরনসর, বাপ, পোকরান ও কুচামন অঞ্চলের ঝিলে তো নিয়মমাফিক নুনের চাষ হয়। ঝিলের পাশে মাইলের পর মাইল জায়গা জুড়ে জমিতে নুন উঠে এসেছে।

এরই সঙ্গে পুরো রাজ্যটাকে তেরছাভাবে কেটে রেখেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বতমালাগুলির অন্যতম আরাবল্লী। এর উচ্চতা যদিও কম, বয়সে কিন্তু এটি হিমালয়ের থেকেও পুরোনো। একেবারে এর কোলেই অবস্থান করছে সিরোহি, ডুঙ্গারপুর, আবু, আজমের এবং আলওয়ার। উত্তর-পূর্বে আরাবল্লী পর্বতমালা দিল্লিকে ছুঁয়েছে এবং দক্ষিণ পশ্চিমে গুজরাতকে। মোট দৈর্ঘ্য সাতশো কিলোমিটার, তার মধ্যে পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার রাজস্থানকে কেটে রেখেছে। রাজ্যের এই অংশটুকুকেই বর্ষার ক্ষেত্রে সম্পন্নতম এলাকা বলে মনে করা হয়। আরাবল্লী থেকে নেমে এসে উত্তরে, উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আরও একটা ভাগ রয়েছে। যে ভাগে পড়ে উদয়পুর, দুঙ্গারপুরের কিছু অংশ এবং বাঁসওয়াড়া, ভিলওয়াড়া, বুন্দি, টোঁক, চিতোরগড়, জয়পুর এবং ভরতপুর জেলা। মরুনায়কজি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ব্রজভূমির সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে ভরতপুর। দক্ষিণ-পূর্বের মালভূমি

অঞ্চল এখানে এসেই শেষ হয়েছে। এরই মধ্যে রয়েছে কোটা, বুঁদি, সওয়াইমাধোপুর এবং ধৌলপুর। ধৌলপুর থেকেই শুরু হয়ে গেল মধ্যপ্রদেশের বিহড়। ভূপৃষ্ঠে বা ধরিত্রীতে যেখানে যেভাবে মাটির স্বভাব পাল্টেছে, ঠিক সে ভাবেই ওপরে আকাশের স্বভাবও বদলাতে থাকে।

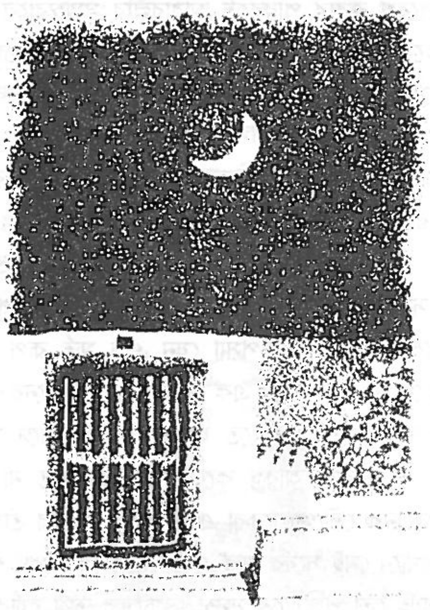

আমাদের দেশে বর্ষা আসে মৌসুমি বায়ুতে চড়ে। মে-জুন মাসে সারা দেশ তপ্ত হয়ে ওঠে। এই অতিরিক্ত তাপের ফলে বাতাসের চাপ ক্রমাগত কমতে থাকে। অন্য দিকে সমুদ্রের ভারী হাওয়া নিজের শরীরে সমুদ্রের সমস্ত আর্দ্রতাকে মেখে নিয়ে যেখানে বাতাসের চাপ কম সেইদিকে উড়ে চলে। এই হাওয়াকেই বলে মৌসুমি বায়ু।

রাজস্থানের আকাশে মৌসুমি বায়ু আসে দুই দিক থেকে। প্রথমত, আরব সাগরের দিক থেকে, দ্বিতীয়ত বাংলার বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে। কিন্তু দু-দিক থেকে আসা মেঘও এখানকার কোথাও কোথাও ততটা বৃষ্টি ঘটাতে পারে না, যতটা তারা বর্ষিত করে থাকে তাদের আসার পথের ওপর যে কোনো স্থানে।

সুদূর বঙ্গোপসাগরে যে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সূচনা, তা বিশাল গাঙ্গেয় সমভূমি পার হয়ে আসতে আসতে নিজের সমস্ত আর্দ্রতাই প্রায় হারিয়ে ফেলে। রাজস্থান পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার অঞ্জলিতে আর ততটা জল থাকে না, যে সে রাজস্থানকে পর্যাপ্ত জল দিতে পারবে। আর আরবসাগর থেকে উত্থিত মৌসুমিবায়ু যখন এখানকার তপ্ত এলাকায় পৌঁছায়, তখন প্রচণ্ড গরম তার অর্ধেক আর্দ্রতাই শুষে নেয়। পুরো রাজ্যকে আড়াআড়িভাবে কেটে রেখেছে যে আরাবল্লী এতে তারও ভূমিকা রয়েছে।

আরাবল্লী প্রসারিত রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে। মৌসুমিবায়ুও একই পথে প্রবাহিত হয়। তাই মৌসুমিবায়ু আরাবল্লী পার হয়ে পশ্চিমের মরুভূমিতে

প্রবেশ করার পরিবর্তে আরাবল্লীর সমান্তরালে বয়ে চলে এবং চলার পথে বর্ষিত হতে হতে চলে। তাই সিরোহি ও আবুতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। প্রায় একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার। পরিমাণটা রাজ্যের গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় তিনগুণ। এই অংশটি আবার আরাবল্লীর উচ্চতর অঞ্চল বলে মৌসুমিবায়ু এখানে ধাক্কা খেয়ে নিজের অবশিষ্ট জলীয় বাষ্প সবই বিতরণ করে যায় এবং মরুভূমিকে আরাবল্লীর পিছনে ফেলে রেখে শেষ হয় আজকের ভূগোলের সামর্থ্যও।

কিন্তু মাটি, বর্ষা ও তাপের এই যে নতুন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, মরুভূমির 'সমাজের' নিজস্ব ভাষা কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মরুভূমির সমাজে মাটি, বর্ষা ও তাপের তপস্যা যেন এক মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে, সাধনায় পরিণত হয়েছে। যে সাধনার এক দিকে রয়েছে জীবনের তেজময়তা এবং অন্যদিকে শীতলতা। ফাল্গুন মাসের হোলিতে আবির-গুলালের সঙ্গে সঙ্গেই মরুনায়কজি মরুভূমিতে হলুদ বালি ওড়াতে আরম্ভ করেন। চৈত্র আসতে না আসতেই ধরিত্রী তপ্ত হতে থাকে। আধুনিক ভৌগোলিকেরা এখানকার যে সূর্যের তাপে ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, এখানে সেই সূর্যের আর এক নাম 'পিথ'। পিথ শব্দটির একটি অর্থ হল জল, কেননা সূর্যই তো পৃথিবীতে সমস্ত জলচক্রের তথা বর্ষার প্রভু ।

আষাঢ়ের প্রারম্ভে সূর্যের চারিদিকে যে এক বিশেষ প্রভামণ্ডল দেখা যায়, তাকে বলা হয় 'জলকুণ্ডো'। জলকুণ্ডোকে বর্ষার ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়। এই সময়ের উদিত সূর্যে যদি 'মাছলো' অর্থাৎ মাছের আকারের এক বিশেষ রশ্মি দেখা যায়, তাহলে অনতিবিলম্বেই বর্ষার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করা হয়। সমাজকে বর্ষার ইঙ্গিত দিতে চাঁদও অবশ্য পিছিয়ে থাকে না। আষাঢ়ে চন্দ্রকলা যদি লাঙলের মতো সোজা দাঁড়িয়ে থাকে এবং শ্রাবণে তার মুদ্রা হয় বিশ্রামের, অর্থাৎ যেন শুয়ে রয়েছে এমন তাহলে ঠিকঠাক বর্ষা হবে। 'উভো ভলে অষাঢ়, সুতো ভলো সরাবন'। এ জাতীয় জলকুণ্ডো, মাছলো এবং চাঁদের বিভিন্ন রূপক সংক্রান্ত আলোচনায় ভর্তি রয়েছে ভডলি পুরাণ। ভডলি পুরাণ রচনা করেন ডঙ্ক নামক এক জ্যোতিষাচার্য। ভডলি তার স্ত্রী। কোন কোন জায়গায় দুজনকে একই সঙ্গে স্মরণ করার চল রয়েছে। সে সব জায়গায় এই পুরাণকে বলা হয় ডঙ্ক-ভডলি পুরাণ।

মেঘ এখানে সব থেকে কম আসে কিন্তু তবু যদি এখানে মেঘের সব থেকে বেশি নাম পাওয়া যায়, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শুদ্ধ ভাষা ও চলিত ভাষাতে 'ব' এবং 'ওয়'-র পার্থক্যে, পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্যে বাদল হয়ে যায় ওয়াদল, ওয়াদলি হয়ে যায় বাদলো বা বাদলি। সংস্কৃত থেকে এসেছে বর্ষা,

জলহর, জীমূত, জলধর, জলবাহ, জলধরণ, জলদ, ঘটা, ক্ষর (তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়), সারঙ্গ, ব্যোম, ব্যোমচর, মেঘ, মেঘাড়াম্বর, মেঘমালা, মুদির, মাহিমণ্ডল-এর মতো নামগুলি। আর চলিত ভাষায় তো নামের অঝোর ধারা— ভরণনদ, পাথোদ, ধরমণ্ডল, দাদর, ডম্বর, দলবাদল, ঘন ,ঘনমণ্ড, জলজাল, কালিকাঁঠল, কালাহন, কারায়ন, কন্দ, হব্র, মৈমঁট, মেহাজল, মেঘাণ, মহাঘণ, রামইয়ো এবং সেহর। মেঘের এত প্রতিশব্দ এখানে পাওয়া যায় যে তার নিজেরই কম পড়ে যাওয়ার দশা। যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে তৈরি করা এই তালিকায় যে কোনো গো-পালক ইচ্ছে করলেই আরও দু-চারটে নাম জুড়ে দিতে পারে।

ভাষা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা সম্পর্কে সমাজের গভীর অনুভব শুধুমাত্র এই কিছু নামের সঙ্গেই শেষ হয় না। মেঘের আকার-প্রকার, চাল-চলন ও স্বভাবের ওপর ভিত্তি করেও করা হয়েছে শ্রেণীবিভাজন। বড় বড় মেঘগুলোকে বলা হয় 'সিখর', আর ছোট ছোট তরঙ্গায়িত মেঘগুলো 'ছিতরি'। যে দুই-এক টুকরো মেঘ, ছড়িয়ে থাকা বিস্তৃত মেঘদল থেকে আলাদা হয়ে যায়, সেও উপেক্ষার পাত্র নয়। তারও একটা নাম আছে-'চুঁখো'। দূর থেকে ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে বর্ষার যে মেঘ উড়ে আসে, তাকে বলা হয় 'কোলায়ণ'। ঘন কালো মেঘের আগে আগে যেন সাদা পতাকা নিয়ে চলেছে যে এক খণ্ড মেঘ সে 'কোরণ' অথবা 'কাগোলড়'। আর শ্বেত পতাকা ছাড়াই ছুটে আসে যে মেঘপুঞ্জ

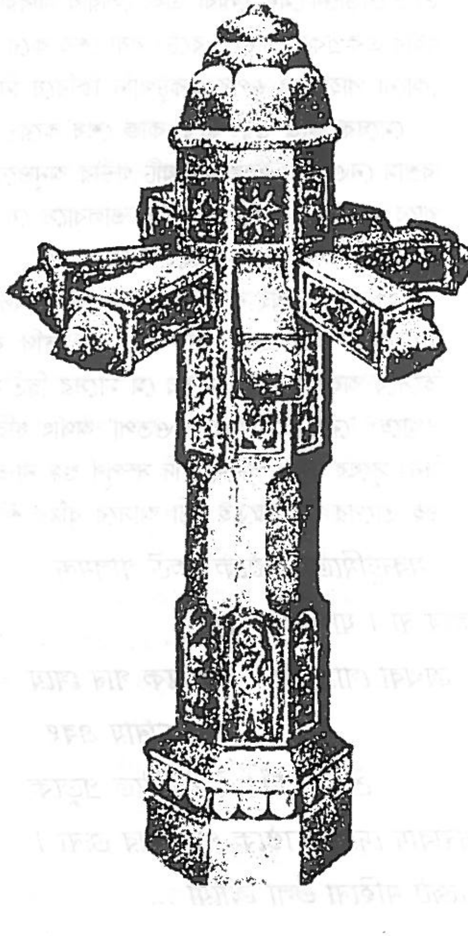

তার নাম 'কাঁঠল' বা 'কলায়ন'।

এত ধরনের মেঘ রয়েছে আকাশে যে মাত্র চারটি দিকে কুলোয় না। তাই দিকও আবার আট প্রকার, এমনকী ষোলো প্রকারও। সমস্ত দিকগুলিরই আবার স্তরবিন্যাস রয়েছে। আর এক-একটা দিকের ওপরে, নীচে ও মাঝে উড়ে বেড়াচ্ছে যে মেঘগুলো তাদেরও আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে। হালকা ও উঁচুতে ভেসে থাকা মেঘ হল 'কস' বা 'কসওয়াড়'। নৈঋত কোণ থেকে ঈশান কোণের দিকে একটু নীচে জোরে বয়ে চলে যে মেঘ তার নাম 'ভঁব'। সারাদিনই ঘন হয়ে রয়েছে যে মেঘটা আর ঝিরঝিরে অল্পস্বল্প বৃষ্টিও হচ্ছে, সে হল 'সহাড়'। পশ্চিমে দ্রুত উড়ে বেড়ানো মেঘ 'লোঁরা' এবং লোঁরার অবিরাম বৃষ্টির ধারা 'লোঁরাঝড়'। লোঁরাঝড় বর্ষার একপ্রকার গান-ও বটে। বর্ষা শেষ করে অর্থাৎ নিজের কর্তব্য সমাপন করে কোনো পাহাড়ের ওপর একটুখানি জিরিয়ে নিচ্ছে যে মেঘটা? সে তো 'রিঙ্গি'।

মেঘেরা কাজ শুরু করে, কাজ শেষ করে; শুধু তাই নয়, কাজের শেষে তাদের বিশ্রাম নেওয়া— পুরো পর্যায়টি গভীর অনুভবে দ্বারা অনুভব করতে পারে বুঝতে পারে যে সমাজ, মেঘেদের এত ভালবাসে যে সমাজ, তারা তার প্রতিটি বিন্দুকে কতই না মঙ্গলময় মনে করে, তাই না?

এখন তো সূর্যই বর্ষণ করে চলেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। এই দিন থেকে শুরু হয় 'নৌতপা'। এই তিথি কখনও বদলায় না। ক্যালেন্ডারের হিসেবে অবশ্য এই তিথি হয় মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অথবা কোনোবার তৃতীয় সপ্তাহে। 'নৌতপা' অথবা 'নওতপা' অর্থাৎ ধরিত্রীর সব থেকে বেশি তপ্ত হওয়ার দিন। সূর্যের তাপে পৃথিবী যদি সম্পূর্ণ শুষ্ক না হয় তাহলে তো ভালো বর্ষা হবে না। এই তাপের তপস্যাতেই তো আসবে বৃষ্টির শীতলতা।

মরুভূমিতে জ্যৈষ্ঠকে কেউ গালমন্দ
করে না। যারা পশু চরায়
অথবা গোয়ালারা, জ্যৈষ্ঠকে গান গেয়ে
স্বাগত জানায় এবং
শুদ্ধ কবির-ই শৈলীতে প্রভুকে
ধন্যবাদ দেয় জ্যৈষ্ঠকে পাঠানোর জন্য।
'জেঠ মহিনো ভঁলা আয়ো ...

ওম-গোম[৫], আকাশ এবং ধরিত্রীর, ব্রহ্ম এবং সৃষ্টির সম্বন্ধ, শাশ্বত। প্রখর রৌদ্রের আরও এক নাম 'ঘাম'। এই ঘাম শব্দ রাজস্থান ছাড়াও বিহার উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কিছু জায়গাতে প্রচলিত পাওয়া যায়। কিন্তু 'ঔঘমো' শব্দটি শুধুমাত্র রাজস্থানেই শোনা যায়, যার অর্থ - বর্ষার ঠিক আগেকার উত্তপ্ত সূর্য।

এ সময় মরুভূমিতে 'বলতি' অর্থাৎ লু এবং বালির ঝড় বইতে থাকে। খবরের কাগজে শিরোনাম হয়— 'মরুভূমির জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে'। রেল লাইন, পাকা রাস্তা সবই বালির তলায় চলে যায়। তবুও এখানকার মানুষ এখনো পর্যন্ত এই ভয়ংকর ঝড়কে প্রকৃতির লীলারই এক অংশ বলে মনে করে।

তাই মরুভূমিতে জ্যৈষ্ঠকে কেউ গালমন্দ করে না। পুরো শরীর ঢেকে রাখা হয়, শুধু মুখটুকু খোলা থাকে। জোরে বয়ে চলা দক্ষিণী হাওয়া বালি তুলে তুলে মুখে ছুঁড়ে মারতে থাকে। তবুও যারা পশু চরায় অথবা গোয়ালারা, তারা জ্যৈষ্ঠকে গান গেয়ে স্বাগত জানায় এবং জ্যৈষ্ঠকে পাঠানোর জন্য শুদ্ধ কবির-ই শৈলীতে প্রভুকে ধন্যবাদ দেয়। 'জেঠ মহিনো ভঁলা আয়ো দক্ষন বাজে বা (হাওয়া), কানোঁ রে তো কাঁকড় বাজে ওয়ারে সাঁই ওয়াহ্'।

এ রকম গল্পও পাওয়া যায়— বারো মাস এক সঙ্গে বসে কথা বলছে, প্রতিটি মাসই নিজেকে প্রকৃতির যোগ্য পুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছে। প্রতিযোগিতায় কিন্তু বাজি জেতে জ্যৈষ্ঠই। সে-ই 'জ্যেষ্ঠ' অর্থাৎ সব থেকে বড় ভাই বলে স্বীকৃতি পায়। জ্যৈষ্ঠ যদি তাপ না দেয়, বালির ঝড় যদি না ওঠে তাহলে তো 'জমানো' ভালো হবে না। জমানো, অর্থাৎ বর্ষাকাল। বর্ষাকাল— চাষবাস ও ঘাসচারার জন্য ঠিক সময়। এই সময়ই 'পিথ' অর্থাৎ সূর্য নিজের অর্থ পাল্টে জলের রূপ ধারণ করে।

আওগাল[৬] থেকে শুরু হয় বর্ষা আগমনের সংকেত। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেরা বেরোবে চাদর ছড়িয়ে 'ডেডরিয়ো' খেলতে, আর বড়রা বেরোবে 'চাদরগুলো' পরিষ্কার করতে। যে যে জায়গা থেকে বর্ষার জল সংগ্রহ করা হবে, সেখানের আঙিনা ছাত ও কুণ্ডিগুলোর 'আগৌর'[৭] পরিষ্কার করা হবে। জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে চলেছে, আষাঢ় এসে পড়ল, তবু এখনও বর্ষার দেরি আছে। আষাঢ়ের শুক্লা একাদশী থেকে শুরু হবে 'বরসালি' বা 'চৌমাসা'[৮]। এখানে বর্ষা কম, কম দিনই বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সমাজ বর্ষার অভ্যর্থনায় অপেক্ষা করে থাকে পুরো চারটি মাস।

যে সমাজের হৃদয় এই অল্প একটু মেঘকেই এত নামে স্মরণ করে থাকে, তারা তার রূপোর মতো জলবিন্দুগুলিকে কতই না রূপে দেখেছে, কত নামেই না ডেকেছে। এখানেও তাই নামের ধারা পাওয়া যাবে।

বৃষ্টিবিন্দুর প্রথম প্রতিশব্দই হল 'হরি', দ্বিতীয় নাম 'মেঘপুহুপ'। বৃষ্টি শব্দটি থেকে চলিত ভাষায় এসেছে 'বিরখা' ও 'ব্রখা'। ধনসম্পদের তথা মেঘের সার হল 'ধনসার' এবং আরও এক নাম 'মেওলিয়ো। বৃষ্টি বিন্দুরই এত নাম, যে নামের মালা গাঁথা যেতে পারে। 'বুলা' ও 'সিকর' শব্দের অর্থ হল জলকণা।'ফুহার' ও 'ছিঁটা'

শব্দ সব জায়গাতেই পাওয়া যায় এবং তার থেকেই এসেছে 'ছাঁটো', 'ছাঁটা'-'ছড়কো', 'ছহোহো' প্রভৃতি। আবার আকাশ থেকে টপকানো অর্থাৎ ঝরে পড়ার জন্য 'টপকা', 'টপকো' এবং 'টিপো' জাতীয় শব্দগুলির উদ্ভব। দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি হল, 'ঝরমর'। একই অর্থেই আবার পাওয়া যায় 'পুণঙ্গ' ও 'জিখা' জাতীয় শব্দ। দুই-এক ফোঁটার থেকে একটু বেশি অর্থাৎ ঝিরঝিরে বর্ষা হল 'রিঠ' ও 'ভোট'। আর এই ঝিরঝিরে বৃষ্টি ক্রমাগত চলতে থাকলে তা হল 'ঝড়মন্ডণ'।

বর্ষার চার মাস এবং প্রতিটি আলাদা আলাদা মাসে যে বৃষ্টি হয় তারও আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল 'হলুর', তবে তা শ্রাবণ ভাদ্রের বৃষ্টি। ঠান্ডায় যে ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি হয় তা হল 'রোহাড়'। 'বর্ষাওলি' থেকে শুদ্ধ ভাষায় এসেছে 'বরখাওয়ল' শব্দ, অর্থ অবশ্য সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। 'মেহান্ঝড়'— অর্থাৎ বৃষ্টির গতি বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে সময়ও। 'ঝাপটো' বৃষ্টিতে কেবল গতিই বাড়ে কিন্তু সময় কমে যায়, অর্থাৎ এক ঝটকায় যেন সমস্ত জল ঝরে যায়।

মুসলধার বৃষ্টির জন্য যে শব্দ ব্যবহৃত হয় তা হল 'ত্রাট', 'ত্রমঝড়', 'ত্রাটকনো' এবং 'ধরহরনো'। 'ছোল' শব্দে এই ধরনের বৃষ্টিই বোঝায় তবে তার পরিধির মধ্যে আনন্দের অর্থও ঢুকে পড়ে। এই ছোল, এই আনন্দ অবশ্যই শহরে জল সরবরাহ নলের শোঁ-শোঁ শব্দের নয়। এইরকম তীব্র বর্ষার সঙ্গে বয়ে আসে যে শব্দ তাকে বলে 'সোক' বা 'সোকড়'। বর্ষণ কখনো কখনো তীব্র, সশব্দে এবং এত দ্রুত হয়ে যায় যে মেঘ ও মাটির দীর্ঘ দূরত্ব ক্ষণিকের মধ্যে মাপা হয়ে যেতে পারে। তখন মেঘ থেকে মাটি স্পর্শ করে যে জলধারা তাকে বলা হয় 'ধারোলি'।

বর্ষা এবং তার প্রতিশব্দের বৈচিত্র্য এখানেই কিন্তু শেষ হয় না। 'ধারোলি' বৃষ্টির ছাঁট যখন বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে এসে পড়ে তখন তাকে বলা হয় 'বাছাড়'। আর বাছাড়ের আর্দ্রতায় নেতিয়ে নরম ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাওয়া ভিজে কাপড়ের বিশেষণ হল 'বাছাড়বায়ো'। ধারোলির সঙ্গে যে শব্দ শোনা যায় তাকে বলা হয় 'ধমক'। এই শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং ওজনেও যথেষ্ট ভারী। ধমককে সঙ্গে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে যে হাওয়া প্রবাহিত হয়, তার নাম 'ওয়াবল'।

ধীরে ধীরে ওয়াবল-এর গতি কমে আসে, ধমক শান্ত হয়ে যায়, কিছুক্ষণ আগেই যে ধারোলি মাটি স্পর্শ করেছিল তাও আবার মেঘের ভিতর মিলিয়ে যায়। বৃষ্টি থেমে যায়। তার পরও কিন্তু কিছু মেঘ আকাশে থাকে যায়। অস্তগামী সূর্য সেখান থেকে উঁকি দেয়। অস্ত সূর্যের সে কিরণকে বলে 'মোঘ' এবং এও বর্ষার এক ইঙ্গিত। মোঘ দেখা গেলে রাত্রে আবার বৃষ্টি হবে। যে রাত্রে খুব বৃষ্টি হয় তা

সাধারণ রৈন নয় তা হল 'মহারৈন'।

বৃষ্টি হওয়া সংক্রান্ত ক্রিয়ার নামে 'তুঠনো' এবং তা কমে আসা 'ওবরেলো'। ততদিনে চৌমাসা পেরিয়ে যায়। বর্ষা আরম্ভ হওয়া থেকে কমে আসা পর্যন্ত প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি শহর ঘরের ছাতে, উঠোনে, খেতে, চৌরাস্তায় এমনকী নির্জন প্রান্তরেও জলকণাগুলিকে সংগ্রহ করে রাখার জন্য যেন চাদর বিছিয়ে রাখে।

'পালর' অর্থাৎ বর্ষার জল সংগ্রহ করে রাখার জন্যও এখানে বৃষ্টির প্রতিশব্দের মতোই যেন অসংখ্য নিয়ম রয়েছে। বিন্দু-বিন্দু জল জমে কলস ও সমুদ্র— দুইই ভরে ওঠে— এই ধরনের প্রবাদ প্রবচন কোনো পাঠ্য বইতে নয়, আমাদের সমাজের যৌথ স্মৃতির গভীরেই পাওয়া সম্ভব। এই স্মৃতি থেকেই তৈরি হয় শ্রুতি। এই শ্রুতি সমাজ স্মরণে রেখেছে, পরবর্তী প্রজন্মকে শুনিয়েছে এবং জল সংগ্রহের এই বিশাল ঐতিহ্যসম্পন্ন কাজকে কখন যেন একটু একটু করে ক্রমশ ব্যবহারিক ও যথেষ্ট প্রণালীবদ্ধ করে এমন এক পরিকাঠামো তৈরি করেছে যে সমস্ত সমাজ সেখানে এক প্রাণ হয়ে উঠেছে। এই পরিকাঠামোর আকার এত বড় যে তা রাজ্যের প্রায় তিরিশ হাজার গ্রাম এবং তিনশো শহর ও মফস্বলের সকল মানুষের ভিতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক নিরাকার রূপ নিয়েছে।

এই নিরাকার সংগঠনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এখানকার জনসমাজ, না রাজ্য না সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে, না আধুনিক পরিভাষা অনুসারে যাকে ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ বলে চিহ্নিত করা হয়— সেইরকম কারো হাতে। পুরোনো পরিভাষায় যাকে বলে 'নিজের হাতে রাখা', সমাজ এ ব্যবস্থাকে সেরকম ভাবেই রেখেছে। প্রতিটি ঘর প্রতিটি গ্রাম থেকে মানুষ এই পরিকাঠামোকে বাস্তব রূপ দিয়েছে, বাঁচিয়ে রেখেছে এবং উন্নত রূপ দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছে।

'পিঁডওড়ি' শব্দের অর্থ নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম এবং সেই পরিশ্রম দিয়ে অন্যকে সহায়তা করা। বর্ষার প্রতিটি জলবিন্দুকে সংগ্রহ করে রাখার জন্য সকলে মিলে পরিশ্রম করেছে, ঝরে পড়েছে কর্মক্লান্ত ঘাম বিন্দু।

রাজস্থানের রজতবিন্দু

'কুঁই'- এর ভিতর কাজ করছে 'চেলওয়াজি'। ঘামে ভিজে গেছে তার শরীর। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাত গর্ত হয়ে গেছে। এবার গর্ত যত গভীর হতে থাকবে, গরমও তত বেড়ে চলবে। কুঁই- এর ব্যাস অর্থাৎ ঘের খুবই সংকীর্ণ হয়। উবু হয়ে বসে থাকা চেলওয়াজির পিঠ ও বুকের থেকে কুঁই- এর দেওয়াল মাত্র একহাত দূরে। এই সংকীর্ণ জায়গায় গাঁইতি বা টামনা দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা যাবে না, তাই খোঁড়া হচ্ছে 'বাঁসলা' দিয়ে। বাঁসলা, টামনার মতোই দেখতে তবে টামনার তুলনায় এটি আকারে ছোট এবং এর হাতলটিও হয় ছোট। বাঁসলার ফলাটা হয় লোহার, হাতল কাঠের।

কুঁই-এর ভিতর খোঁড়ার কাজ একে তো পরিশ্রমের, তার ওপর আবার প্রচণ্ড গরম। এই গরম কাজের ওপর প্রভাব ফেলে। গরম কমানোর জন্য ওপরে যারা রয়েছে তারা কিছুক্ষণ পর-পর মুঠো-মুঠো বালি জোরে-জোরে কুঁইয়ের ভেতরে ছুঁড়তে থাকে। এতে খানিকটা টাটকা হাওয়া ওপর থেকে নীচে নেমে যায় এবং নীচের দম বন্ধ করা কিছুটা গরম হাওয়া ওপরে উঠে আসে। নীচে চেলওয়াজি একা কাজ করে চলেছে। ওপর থেকে ছোঁড়া বালি তার মাথায় লাগতে পারে তাই সে মাথায় পরে রয়েছে কাঁসা বা পিতলের টুপির মতো কোনো পাত্র। কিছুটা খোঁড়া হতেই চেলওয়াজির চার পাশে মাটি, বালি জমে উঠছে। ওপর থেকে দড়িবাঁধা ছোট বালতি নামিয়ে সেগুলো তুলে নেওয়া হবে। যতই সাবধানতার সঙ্গে দড়ি টানা হোক না কেন তোলার সময় কিছু বালি ও কাঁকর পড়তেই পারে। মাথায় বসানো ধাতব টুপি মাথাকে এই আঘাত থেকে বাঁচিয়ে থাকে।

কুঁই খোঁড়া এবং তাতে বিশেষ এক ধরনের পলেস্তরা লাগানোর দক্ষতম লোকই হল 'চেলওয়াজি' বা 'চেজারো'। চেজারো যে 'কুঁই' তৈরি করে তা মোটেই কোনো সাধারণ স্থাপত্য নয়। কুঁই হল খুবই ছোট কুয়ো। কুয়ো হল পুংলিঙ্গ, কুঁই স্ত্রীলিঙ্গ। কুঁই অবশ্য শুধু ব্যাসেই ছোট, গভীরতায় কিন্তু কারো থেকে কম নয়, তবে তারতম্য হয়ে থাকে। হয়তো এর বিশেষ কোন কারণ রয়েছে এবং তাই রাজস্থানের এক-এক স্থানে কুঁইয়ের গভীরতা এক-এক রকম দেখা যায়।

আরও এক অর্থে কুয়োর থেকে কুঁই সম্পূর্ণ আলাদা। কুয়ো তৈরি হয় ভৌমজল পাওয়ার জন্য, কুঁই কিন্তু ভৌমজলের সঙ্গে ঠিক সেভাবে সম্পর্কিত নয়। এটি বর্ষার জলকে, বর্ষা ছাড়া অন্যান্য ঋতুতেও বড়ই বিচিত্র ভাবে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ কুঁই-তে যে জল পাওয়া যায় তা বৃষ্টির পর মাটির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জলও নয়, আবার ভৌমজলও নয়। এ যেন সেই নেতি-নেতি সংক্রান্ত দার্শনিক সমস্যার মতো প্যাঁচালো ব্যাপার। মরুভূমিতে বালির গভীরতা ও বিস্তৃতি সীমাহীন। এখানে যদি বৃষ্টি বেশি পরিমাণেও হয় তাহলেও তা বালির তলায় চলে যেতে সময় লাগবে না, কিন্তু মরুভূমিতে কোথাও কোথাও বালির তলায় এই দশ-পনেরো হাত নীচ থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত পর্যন্ত খড়িয়া নামক এক ধরনের পাথরের স্তর চলে গেছে। এই স্তর যেখানেই রয়েছে, সেখানে তা বেশ লম্বা-চওড়া, বিস্তৃত। তবে বালির তলায় চাপা থাকার জন্য ওপর থেকে দেখা যায় না।

এরকম জায়গায় বড় কুয়ো তৈরির সময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ক্রমে মাটির চরিত্রের পরিবর্তন দেখেই খড়িয়া স্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণত বড় কুয়ো-

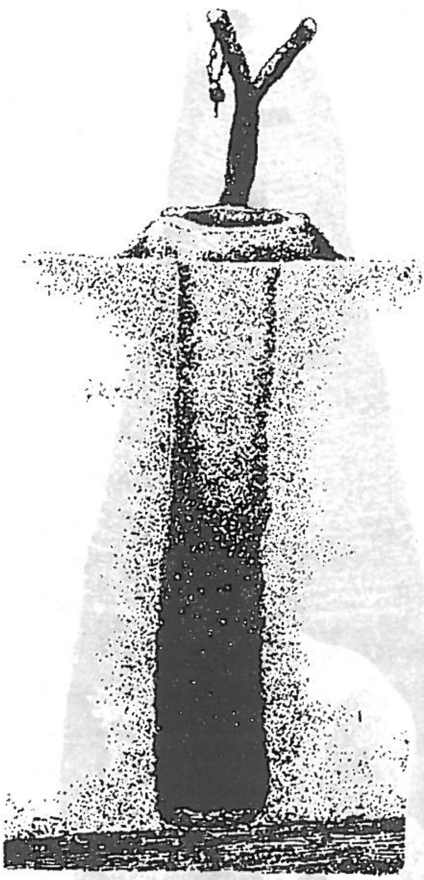

গুলোতে জল পাওয়া যায় একশো-দুশো হাত গভীরে আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে জল নোন্‌তা ও বিস্বাদ। পানের অযোগ্য। তাই এসব স্থানে কুয়োর বদলে কুঁই খোঁড়া হয়। খড়িয়া পাথরের স্তর খুঁজে পাওয়ার জন্য বংশানুক্রমিক অভিজ্ঞতাও কাজে লাগে। যদি দেখা যায় যে বর্ষার জল কোন স্থানে একদমই বসছে না (অর্থাৎ জমা হওয়ার পরই তা ধীরে ধীরে শোষিত হয়ে যাচ্ছে), তাহলেই বুঝতে হবে সেখানে বালির নীচে খড়িয়া পাথরের স্তর বিছানো রয়েছে। এই স্তর বর্ষার জলকে মাটির একেবারে গভীরে গিয়ে নোন্‌তা ভৌমজলের সঙ্গে মিশে যেতে দেয় না। তাই যে স্থানে, যতদূর এই খড়িয়া পাথরের স্তর রয়েছে, ততদূর পর্যন্ত বর্ষার জল মাটির অল্প নীচে বালুকাময় উপরিভাগ ও নীচে খড়িয়া পাথরের স্তরের মাঝে আটকে বিস্তৃত এক আর্দ্রতা রূপে মাটির ভিতর ছড়িয়ে যায়। প্রচণ্ড গরমের সময় এই জল যে বাষ্প হয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাবে, সে আশঙ্কা অমূলক নয়। তবে এক্ষেত্রেও প্রকৃতিরই এক বিচিত্র উদারতা সমস্যার সমাধান করে দেয়। বালির কণাগুলি আয়তনে খুবই ক্ষুদ্র। অন্য জায়গায় যেসব মাটি পাওয়া যায়- তাদের মতো এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে যায় না। আসলে যেখানে বন্ধন সেখানেই তো দেখা যায় বন্ধনহীনতা। যেসব স্থানে মাটির কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে যায়, সেখানে তারা নিজের জায়গা ছেড়ে এসে তবেই পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হতে পারে। ফলে, কিছুটা করে জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়। যেমন, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে যেখানে 'দোমঠ' অর্থাৎ

কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল রয়েছে, সেখানে বর্ষার শেষে রোদ উঠলেই মাটির কণাগুলি একে অপরের সঙ্গে সেঁটে যেতে থাকে, এবং মাটিতে, উঠোনে, খেতে সব জায়গাতেই ফাটল দেখা দেয়। বর্ষায় মাটির ভেতরে সঞ্চিত আর্দ্রতা এই ফাটলগুলি দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে।

মরুভূমিতে এলোমেলো ছড়ানো অবস্থার মধ্যেই কিন্তু রয়েছে শৃঙ্খলা। এখানে বালির কণাগুলি সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে। পরস্পরের মধ্যে বন্ধন যেহেতু নেই, তাই বন্ধনহীনতাও দেখা যায় না। জল পড়লে কণাগুলি কিছুটা ভারী হয়ে পড়ে ঠিকই, কিন্তু নিজের জায়গা ছাড়ে না। তাই মরুভূমির মাটিতে কখনই ফাটল দেখা যায় না। মাটির ভেতর ঢুকে পড়া বৃষ্টির জল ভেতরেই থেকে যায়। ওদিকে কিছুটা নীচে রয়েছে একটানা বিস্তৃত খড়িয়া পাথরের স্তর, সে ঐ বৃষ্টির জলকে আটকে রাখে, এদিকে ওপরে রয়েছে অসংখ্য বালুকণার কড়া পাহারা।

এই এলাকায় বৃষ্টির জল বিন্দু বিন্দু করে বালিতে শোষিত হয়ে মাটির গভীরে যেন এক বিস্তৃত আর্দ্রতায় পরিণত হয়। যেখানে 'কুঁই' তৈরি হল, সেখানে এবার তার পেট, অর্থাৎ ভেতরের শূন্যস্থান চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা আর্দ্রতাকে ফের জলবিন্দুতে বদলে নিতে থাকে। এক এক বিন্দু করে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসে, অল্প অল্প করে কুঁইয়ের ভেতর জমা হতে থাকে; চারিদিকে নোনতা জলের সমুদ্রের মাঝে অমৃতের মত মিষ্টি একটুখানি জল।

এই অমৃত পাওয়ার জন্য মরুভূমির সমাজ প্রচুর মন্থন করেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে পরিণত করতে তাদের হাতে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে পুরো একটি শাস্ত্রগ্রন্থ । মরুভূমিতে যে জল পাওয়া যেতে পারে, শাস্ত্র অনুসারে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় প্রথম রূপ হল, 'পালর পানি'। অর্থাৎ বর্ষার সময় সরাসরি বৃষ্টির থেকে পাওয়া যায় যে জল। এই জল ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে যখন বয়ে চলে, তখনই তাকে নদী, পুকুর 'প্রভৃতিতে' আটকে নেওয়া হয়। এই 'প্রভৃতি' শব্দটার মধ্যেও কিন্তু অনেক কথা লুকোন রইল। তার পূর্ণ বিবরণ পরে কোথাও দেওয়া যাবে।

দ্বিতীয় রূপের নাম, 'পাতাল পানি'। এ হল সেই ভৌমজল যা গভীর কুয়ো থেকে তোলা হয়।

'পালর পানি' ও 'পাতাল পানি'-র মাঝখানে থাকে জলের তৃতীয় রূপ, 'রেজানি পানি' এই জল মাটির নীচে প্রবেশ করেছে বটে, কিন্তু একেবারে গভীরে মূল ভৌমজলের সঙ্গে মিশতে পারে না। মরুভূমিতে বৃষ্টির পরিমাণ মাপতে সেন্টিমিটার

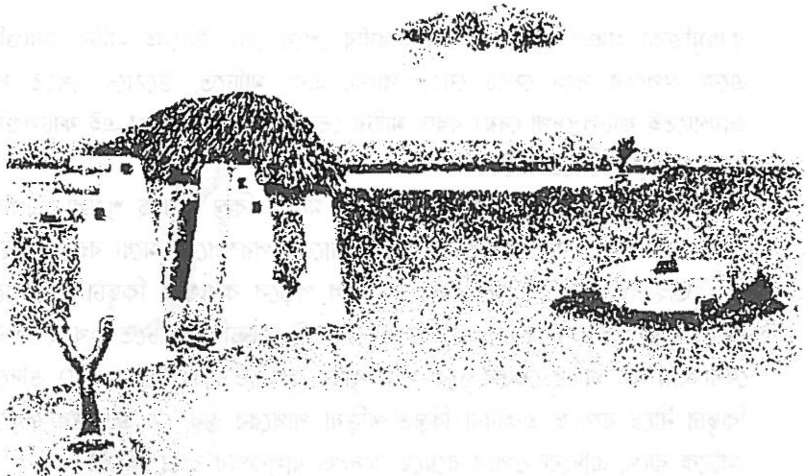

বা ইঞ্চির বদলে 'রেজা' শব্দটি ব্যবহার হয়। এই একক আবার ভূপৃষ্ঠে বর্ষিত জলের পরিমাণ মাপে না, বরং ভূপৃষ্ঠে প্রবিষ্ট জলের হিসেব দেয়। যেমন ধরা যাক, মরুভূমিতে এক দিনে এতটা বৃষ্টি হল যে জল মাটির পাঁচ আঙুল গভীরে যেতে পারল— এক্ষেত্রে এ দিনের বৃষ্টিকে পাঁচ আঙুল রেজো বলা হবে। রেজানি জল খড়িয়া পাথরের স্তরে আটকে পাতাল পানি থেকে আলাদা হয়ে থাকে। যেখানে এই স্তর নেই, সেখানে এই জল আস্তে আস্তে নীচে গিয়ে 'পাতাল পানি' অর্থাৎ মূল ভৌমজলের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। যদি কোনো জায়গার ভৌমজল লবণাক্ত হয়, তাহলে রেজানি জলও তার সঙ্গে মিশে গিয়ে লবণাক্ত হয়ে যায়। এই বিশিষ্ট 'রেজানি পানি' সংগ্রহ করার জন্য যে 'কুঁই' - তার নির্মাণশৈলীও এক বিশেষ শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। চার-পাঁচ হাত ব্যাসের একটা কুঁই ষাট-পঁয়ষট্টি হাত গভীরতা পর্যন্ত নামিয়ে নিয়ে যায় যে সমস্ত চেজারোরা, তারা নির্মাণকৌশল ও সাবধানতার এক চূড়ান্ত স্তরই স্পর্শ করেছে বলা যায়। কুঁই-এর প্রাণ হল শ্রেষ্ঠতম 'চিনাই' বা 'চেজো' অর্থাৎ

পলেস্তরা। এখানে সামান্যতম ক্রটিও চেজারোদের প্রাণনাশের কারণ হতে পারে। প্রতিদিন একটু একটু করে খোঁড়া হয়, সাথে সাথে মাটি-পাথর-বালি সব বের করে নেওয়া হয়, কেননা এর পর খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করার আগেই ইতিমধ্যে যতটা খোঁড়া হয়েছে ততটা 'চিনাই' করে নিতে হবে। তা না হলে ওপরের অংশের মাটি ধবসে পড়তে পারে।

কুড়ি-পঁচিশ হাত খুঁড়ে নীচে নেমে যাওয়ার পর ক্রমশ গরম বাড়তে শুরু করে, হাওয়া কমতে। তখন ওপরে যারা রয়েছে তারা মুঠো-মুঠো বালি জোরে জোরে নীচে ছুঁড়ে মারতে থাকে। মরুভূমিতে বালির বিশাল বিশাল টিলাগুলিকে এদিক থেকে ওদিকে উড়িয়ে নিয়ে যায় যে বাতাস, সেই বাতাস এখানে কুঁই-এর ভিতর একমুঠো বালির সঙ্গে উড়তে উড়তে গরমে ঘেমে-নেয়ে ভেপ্‌সে যাওয়া চেলওয়াজিদের কিছুটা আরাম দিয়ে থাকে। কিছু কিছু স্থানে কুঁই তৈরির এই কঠিন কাজ আরো কঠিন হয়ে পড়ে— প্রচলিত ইঁটের পলেস্তরা মাটির ধবস আটকাতে পারে না, তখন কুঁইকে দড়ি দিয়ে 'বাঁধা' হয়।

যেদিন কুঁই খোঁড়া শুরু হয়, সেদিনই 'খিঁপ' নামের এক জাতীয় ঘাস প্রচুর পরিমাণে জমা করা হয়। চেজারো খোঁড়া শুরু করে, আর বাকি যারা ওপরে থাকে তারা খিঁপ দিয়ে দড়ি পাকাতে শুরু করে।

সাধারণত তিন আঙুল মোটা হয় এই দড়ি। প্রথম দিনের কাজ শেষ হতে দেখা যায়, কুঁই প্রায় দশহাত গভীর হয়ে গিয়েছে। এবার কুঁইয়ের নীচে মেঝেতে দেওয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে ওই দড়ির প্রথম বৃত্ত পাতা হয়। এর ওপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ— এভাবে বাঁধন ওপরে উঠতে থাকে। ঘাসের তৈরি মোটা অমসৃণ দড়ি প্রত্যেকটা পাকের ওপর নিজের ওজনের চাপ ফেলে এবং বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা গিঁটগুলো ক্রমশ একে অপরের সঙ্গে ফাঁস লেগে দৃঢ়ভাবে পরস্পরের ওপর চেপে বসে। দড়ির শেষ প্রান্তটি থাকে কুঁইয়ের ওপরে। পরের দিন আবার কয়েক হাত মাটি কাটা হয়ে যায়। প্রথম দিন দড়ির যে কুণ্ডলী তৈরী হয়েছিল তা আজকে যতটা খোঁড়া হল— ততদূর পর্যন্ত চাপ দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। ওপরের খালি দেওয়ালে নতুন দড়ি দিয়ে নতুন করে আবার ঘেরা দেওয়া হতে থাকে। দড়ির এই পাক যাতে ঠিকঠাক দেওয়ালে আটকে থাকে তার জন্য কোথাও কোথাও মাঝে মাঝে পলেস্তরা করে নেওয়া হয়।

পাঁচহাত ব্যাসের কুঁইয়ের ভিতর কুণ্ডলির এক পাক দিতে পনেরো হাত দড়ি লাগে। এক হাত গর্ত বাঁধতে লাগে আট-দশ পাক দড়ি। অর্থাৎ এটুকু বাঁধতেই দড়ি লাগে প্রায় দেড়শো হাত। এবার যদি ত্রিশ হাত গভীর কুঁই-এর মাটি আটকানোর

জন্য দড়ির পাক দিতে হয় তাহলে প্রয়োজন চার হাজার হাত দড়ি। নতুন প্রজন্ম তো বুঝতেই পারবে না যে এখানে কুঁই খোঁড়া হচ্ছে না কী দড়ি পাকানো হচ্ছে।

কোনো কোনো জায়গায় খিঁপঘাস বা পাথর কোনোটাই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে রেজানি পানি পাওয়া যাবে সেখানে তো কুঁই তৈরি হবেই। এইসব জায়গায় কুঁই-এর ভেতরের পলেস্তরা কাঠের লম্বা লম্বা টুকরো দিয়ে করা হয়। টুকরোগুলি হয় বাবলা, অরণি, বন(কয়ের) কিংবা কুম্বট গাছের কাঠ দিয়ে।

এই কাজের জন্য অবশ্য সবথেকে উত্তম কাঠ হল অরণি। তবে ভাল বা মাঝামাঝি ধরনের কাঠ না পাওয়া গেলে আক দিয়েও কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়।

টুকরোগুলোকে নীচ থেকে ওপরের দিকে একটাকে অন্যটার সঙ্গে আটকে সোজা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর খিঁপের দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও শনের দড়ি দিয়েও বাঁধা হয়। এই পলেস্তরা বা বাঁধাই-এর আকার হয় কুণ্ডলীর মতো, তাই এর আর এক নাম 'সাঁপনী'। নীচে যে চেলওয়াজ মাটি খোঁড়াখুঁড়ি ও পলেস্তরার কাজ করছে সে ভীষণ-ই ভাল মাটি চেনে। খড়িয়া পাথরের স্তরে পৌঁছানো মাত্র সে খোঁড়া বন্ধ করে দেয়। কুঁইয়ের ভেতর জলের ধারা বয়ে আসতে শুরু করেছে। চেজারো ওপরে উঠে আসে।

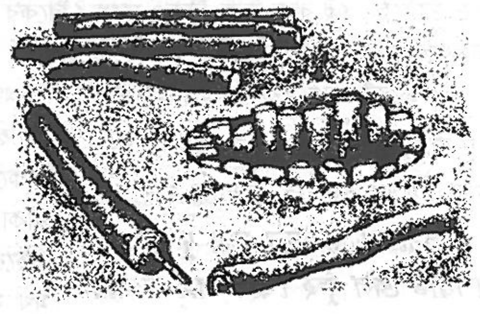

কুঁই খোঁড়ার কাজে সফলতা-প্রাপ্তি অর্থাৎ তার সজলতা, এক সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। প্রথম দিন থেকে যারা কাজ করছে তাদের যত্নআত্তি করাটা এখানকার ঐতিহ্যের মধ্যেই পড়ে। এছাড়াও কাজের শেষ দিনে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ ভোজের। বিদায়ের সময় চেলওয়াজিদের বিভিন্ন উপহারও দেওয়া প্রথা তো ছিলই তবে এখানেই কিন্তু তাদের সঙ্গে ওই গ্রামের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল না; 'আচ' প্রথা অনুসারে সারা বছরের উৎসব, পার্বণ বা বিয়ের মতো মাঙ্গলিক কাজে তাদের উপহার পাঠানো হত। ফসল উঠলে, ফসলের একটা অংশও তারা পেত। এখন অবশ্য শুধুমাত্র মজুরি দিয়েই কাজ করানোর প্রথা চালু হয়ে গেছে।

কোনো কোনো জায়গায় সাধারণ গৃহস্থও এই কুঁই তেরির শিল্পে নিপুণতা অর্জন করেছিল। জয়সলমেরের অনেক গ্রামেই এই রকম 'পলিওয়াল' ব্রাহ্মণ এবং 'মেঘওয়াল' (এখন এরা তফশিলি জাতি বলে চিহ্নিত)-দের হাতে তৈরি একশো-দুশো বছর আগেকার 'পার' ও 'কুঁই' গুলি এখনও অক্লান্তভাবে জলের জোগান দিয়ে চলেছে।

'কুঁই'-এর মুখ ছোট করার কারণ তিনটি। বালিতে সঞ্চিত জল খুব ধীরে ধীরে চুঁইয়ে কুঁই -এর ভিতর জমা হয়। সারাদিনে কুঁইয়ে যতটা জল জমা হয়, তাতে মাত্র দু থেকে তিনটে ঘড়া ভরতে পারে। কুঁই-এর ব্যাস বড় হলে এই অল্প একটু জল বেশি জায়গায় ছড়িয়ে থাকবে, ফলে তোলা সম্ভব হবে না। কিন্তু ছোট ব্যাসে কুঁইয়ের জল ক্রমে ক্রমে দু-চার হাত উচ্চতায় পৌঁছে যায়। আর এইজন্যই কোনো

কোনো জায়গায় এর থেকে জল তুলতে ছোট বালতির বদলে ছোট 'চড়স' ব্যবহার করা হয়। ধাতুর বালতি সহজে জলে ডোবে না, কিন্তু মোটা কাপড় বা চামড়ায় তৈরি চড়সের মুখে ভারী কড়া বাঁধা থাকে— চড়স গিয়ে জলে ধাক্কা মারে, ওপরের ভারী অংশ প্রথমে জলে পড়ে এবং জল কম থাকলেও তা সহজে জলে ডুবে যায়। জল ভরে গেলেই চড়স তার আকার ফিরে পায়।

যেসব গ্রামে কুঁই আছে, তাদের পাশ দিয়ে বেশ কিছুদিন আগেই পাকা সড়ক গেড় উঠেছে। এই রাস্তা দিয়ে ট্রাকও যাচ্ছে। ট্রাকের টায়ারের ফাটা টিউব থেকেও আজকাল ছোট আকারের চড়স তৈরি হচ্ছে।

রাজস্থানের প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে কুঁইয়ের ব্যাসের আয়তনের সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাস বড় হলে জল বেশি জায়গায় ছড়িয়ে থাকবে। আর বেশি জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মানেই অধিক বাষ্পীভবন। কুঁইয়ের জল পরিষ্কার রাখতে তার মুখ সবসময় ঢেকে রাখা দরকার। তাই মুখ ছোট হলে ঢাকা দেওয়া সহজ। প্রতিটি কুঁইয়ে দেখা যায়, তাদের মুখে কাঠের তৈরি ঢাকনা দেওয়া আছে। অনেক জায়গায় আবার ঘাস, ডালপালা প্রভৃতি জড়ো করে তৈরী আচ্ছাদনও দেখা যায়।

প্রতিদিন একটা করে সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের গল্পটার কথাটা মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে। প্রতিদিন মাত্র দু-তিন ঘড়া মিষ্টি জল কুঁই থেকে পাওয়া যায়।

আজকাল যেখানে পাকা রাস্তা হয়েছে, সেখানে নতুন নতুন অপরিচিত লোকের যাতায়াতও বেড়েছে। তাই সেসব স্থানে ওই অমৃতের মতো মিষ্টি জলের সুরক্ষার ব্যবস্থাও প্রয়োজনীয়। এখন এসব এলাকায় অনেক কুঁইয়ের ঢাকনাতেই তাই তালা লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওপরে জল তোলার কপিকল বা চরকিতেও লাগানো হয়েছে তালা।

'কুঁই' গভীর হলে জল তোলার সুবিধার জন্য তাতে ঘড়ঘড়ি বা চরকি (অর্থাৎ কপিকল) লাগানো হয়। একে 'গড়েরি', 'চরখি', বা 'ফরেড়ি'ও বলে। ফড়েরি লোহার তৈরি দুটো বাহুতে লাগানো যেতে পারে। তবে সাধারণত এটি গুলতির মতো একটা কাঠের টুকরোর এপার ওপার ফুটো করে লাগানো হয়। একে 'ওড়াক' বলে। 'ওড়াক' ও 'চরকি' ছাড়া, এত গভীর কুঁই থেকে জল তোলা খুবই কঠিন। এদের সাহায্যে 'চড়স' সহজে ওপরে ওঠানো যায়। কোথাও ধাক্কা লাগে না, জল ছল্‌কেও পড়েনা। এছাড়া কপিকলে ভারী জিনিস তুলবার সুবিধাটুকু তো রয়েইছে।

খড়িয়া পাথরের স্তর এক একটা বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হয়। তাই পুরো এলাকা জুড়ে একটার পর একটা কুঁই তৈরি হতে থাকে। এসব স্থানে একটা

বড়সড় মাঠে ত্রিশ-চল্লিশটা পর্যন্ত কুঁই পাওয়া যেতে পারে। ঘর পিছু একটা কুঁই, পরিবার বড় হলে একের বেশিও।

ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন সম্পত্তির ধারণার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে যে স্থূল সীমারেখা, কুঁই-এ এসে তার এক বিচিত্র সমাপ্তি ঘটে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কুঁই রয়েছে। এটি তৈরি করা এবং তার থেকে জল নেওয়ার অধিকার তারই, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, কুঁই যেখানে তৈরি হয় তা কিন্তু গ্রাম সমাজের সার্বজনীন জমি। এখানে বর্ষিত জলই সারা বছর ধরে আর্দ্রতা রূপে মাটির তলায় জমা থাকে ও চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফের কুঁইগুলিতে ঝরে পড়ে। আর্দ্রতার পরিমাণ আবার নির্ভর করে সে অঞ্চলের বর্ষার ওপর। অতএব, এখন ওই ভূমিতে প্রতিটি নতুন কুঁইয়ের অর্থ হল, পূর্বনির্ধারিত সঞ্চিত আর্দ্রতা ভাগ হয়ে যাওয়া। তাই নিজস্ব হলেও, সার্বজনীন স্থানে নির্মিত এই 'কুঁই' গ্রামসমাজের নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। অত্যন্ত প্রয়োজন হলে তবেই সমাজ নতুন কুঁই-এর স্বীকৃতি দেয়।

প্রতিদিন একটা করে সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের গল্পটার কথাই মনে পড়ে এ প্রসঙ্গে। প্রতিদিন মাত্র দু-তিন ঘড়া মিষ্টিজল কুঁই থেকে পাওয়া যায়। তাই প্রায় সারা গ্রামই গোধূলি লগ্নে কুঁই-তে আসে। যেন মেলা বসে যায়। গ্রামের পাশের মাঠে এক সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশটা চরকির শব্দ চারণভূমি থেকে ঘরে ফেরা পশুদের গলায় বাঁধা ঘন্টা ও খুরের শব্দের সঙ্গে মিশে যায়। দু-তিন ঘড়া জল তোলা হতেই দড়ি-বালতি গুটিয়ে নেওয়া হয়। 'কুঁই' ঢাকা পড়ে। সারা রাত এবং পরের দিন কুঁই বিশ্রাম নেবে। সব জায়গাতেই বালির নীচে খড়িয়া পাথরের স্তর নেই। তাই কুঁইও রাজস্থানের সব জায়গায় পাওয়া যাবে না। চুরু, বিকানের, জয়সলমের এবং বাড়মেরের কিছু এলাকা দিয়ে এই স্তর চলে গিয়েছে, তাই এখানকার গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কুঁই দেখা যায়। যেমন 'খাড়েরোঁর ঢাণি' জয়সলমেরের একটি গ্রাম। এখানে একশো কুড়িটা কুঁই ছিল বলে লোকে নাম রেখেছিল, 'ছহ-বিশি'(অর্থাৎ ছয়গুণ কুড়ি)। কোথাও কোথাও একে 'পার'-ও বলা হয়। জয়সলমের তথা বাড়মেরের অনেক গ্রামেই এই পারের ওপর নির্ভর করেই বসতি গড়ে উঠেছে। তাই এই গ্রামগুলির নামেও রয়েছে পার। যেমন, 'জানরে আলো পার' 'সিরগু আলো পার'।

এক এক স্থানে খড়িয়া পাথরেরও এক এক রকম নাম। কোথাও একে বলা হয় 'চারোলি', কোথাও 'ধাধড়ো, কোথাও এর নাম 'বিট্টু রো বল্লিয়ো'। কোথাও আবার শুধুই 'খড়ি'।

আর এই 'খড়ি' স্তরের ভরসাতেই নোনা জলের মাঝে মিষ্টি জল দেওয়ার সামর্থ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য 'কুঁই' ।

থেমে থাকা জল নির্মল

'প্রবাহিত জলে শ্যাওলা জমে না'— এই প্রবাদটি রাজস্থানে এসে থমকে যায়। এখানে যেসব 'কুণ্ডি' দেখা যায়, তাতে সারা বছর ধরে, এমনকী তার থেকেও বেশি সময় ধরে জমে থাকা জলও সম্পূর্ণ নির্মল থাকে।

ব্যবস্থাটা অবশ্য একই : সেই বৃষ্টির জল অর্থাৎ 'পালর পানি'কে এক পরিচ্ছন্ন জায়গায় সংগ্রহ করা। কুণ্ডি, কুণ্ড, টাঁকা— নাম অনেক, চেহারাও আলাদা আলাদা, কিন্তু কাজ সেই একই; আজকের বর্ষার প্রতিটি বৃষ্টি বিন্দুকে আগামীকালের জন্য সংগ্রহ করে রাখা। কুণ্ডি সব জায়গায় পাওয়া যায়। দুর্গম পাহাড়ের ওপর তৈরী দুর্গে, মন্দিরে, পাহাড়ের পাদদেশে, ঘরের উঠোনে, ছাতে, গ্রামের ভেতরে, গ্রামের বাইরে নির্জন স্থানে, বালির মধ্যে, চাষের জমিতে— সব জায়গায় সব সময় কুণ্ডি তৈরী হয়েছে। তিন চারশো বছর আগের কুণ্ডি যেমন পাওয়া যায়, সেরকম অল্প কয়েকদিন আগে তৈরি হয়েছে সেরকম কুণ্ডিও পাওয়া যাবে। এমনকী স্টার টি.ভি-র অ্যান্টেনার ঠিক নীচেও হয়তো কুণ্ডি পাওয়া যাবে।

যেখানে যতটা জায়গা পাওয়া সম্ভব— সেখানে সেই জায়গাটুকু চুন সুরকি দিয়ে পলেস্তরা করে একটা পাকা উঠোনের মতো তৈরি করে নেওয়া হয়। এই উঠোন হয় ঢাল-ওয়ালা। একদিক থেকে অন্যদিকে, অথবা উঠোন বড় হলে চারপাশ থেকে কেন্দ্রের দিকে রাখা হয় এই ঢাল। উঠোনের পরিসর অনুসারে, বর্ষায় সেখানে কতটা জল বর্ষিত হতে পারে এ সবকিছু বিবেচনা করেই কেন্দ্রে কুণ্ড তৈরি করা হবে। আর কুণ্ডের ভেতরের পলেস্তরা এমন হবে, যাতে এক বিন্দুও জল নষ্ট না হয়; শুধু তাই নয় তা যেন সারা বছর সুরক্ষিত ও পরিষ্কার থাকে।

চারপাশের যে উঠোন থেকে বর্ষার সময় কুণ্ডিতে জল আসে, তাকে 'আগৌর'

বলে। শব্দটা এসেছে 'আগৌরণা' ক্রিয়াপদ থেকে। 'সংগ্রহ' অর্থে। সারা বছরই আগৌর যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। বর্ষার আগে তো যথেষ্ট যত্নসহকারে চলে এটি পরিষ্কারের কাজ। জুতো, চপ্পল এসব আগৌরে নিষিদ্ধ।

আগৌরের ঢাল দিয়ে বয়ে আসা জল কুণ্ডিতে জমা হয়। কুণ্ডির ভিতর গোলাকারে রাখা 'আয়রো' এবং 'সুরাথো'-র মধ্য দিয়ে এই জল কুণ্ডিতে ঢোকে। 'আয়রো' এবং 'সুরাথো' হল এক ধরনের ছিদ্র বা নালি। কোথাও কোথাও এর আরেক নাম 'ইন্ডু'। আগৌর যতই পরিষ্কার রাখা হোক, বর্ষার জলে কিছু বালি, খড়কুটো বয়ে আসেই। এসব ময়লা যাতে কুণ্ডির ভিতর গিয়ে পড়তে না পারে তার জন্য নালাগুলোতে জাল লাগানো থাকে। বড় কুণ্ডিগুলিতে সারা বছর জল টাটকা রাখার জন্য বিশেষ জানালা কেটে আলো-হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা করা হয়।

ছোট হোক বা বড় হোক, কুণ্ডি কখনও খোলা থাকে না। সমাজের চোখে সেটা অশোভন। আর জলের কাজে শোভা তো চাইই। সৌন্দর্য, শুচিতা, পরিচ্ছন্নতা এখানে একইসঙ্গে বর্তমান।

কুণ্ডির মুখ সব সময় গোলাকার হবে এবং ঢাকনা গম্বুজাকার। মন্দির, মসজিদের মতো উঁচু হয়ে ওঠা গম্বুজ দৃশ্যত কুণ্ডিকে সুন্দর করে তোলে। যেখানে পাথরের সুদীর্ঘ স্তর পাওয়া যায়, সেখানে গম্বুজের বদলে পাথরের বড় পাটা ঢাকনা হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। গম্বুজ বা পাথরের পাটা, যা দিয়েই কুণ্ডি ঢাকা হোক না কেন— তার এক কোণায় লোহা বা কাঠের আরও একটা ছোট ঢাকনা লাগানো হবে। এই ছোট মুখটি প্রতিদিনের জল নেওয়ার কাজে লাগবে।

অনেক কুণ্ডই প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত গভীর। তাই কোন গভীর কুয়ো থেকে যেভাবে জল তোলা হয়, এই কুণ্ড থেকে জল তোলার প্রক্রিয়া সেরকমই। জল তোলার জন্য পাড়, তাতে ওঠার জন্য পাঁচ-সাত ধাপ সিঁড়ি, জল তোলার সুবিধার জন্য চরকি বা ঘড়ঘড়ি। চুরু অঞ্চলের কয়েক জায়গায় খুবই বড় আর গভীর কুণ্ড দেখা যায়। গভীরতার জন্যই এদের চরকি বা কপিকল গুলো খুবই শক্তপোক্ত। কেননা অত তলা থেকে জল নিয়ে বালতি যখন ওপরে উঠতে থাকে, তখন তার পুরো ওজন তো পড়ে এদেরই ওপর। তাই দুই দিকে দুটি মিনারের মতো স্তম্ভে চরকি বসানো হয় স্থায়ীভাবে, কোথাও কোথাও আবার চারটি স্তম্ভে চরকি লাগানো হয়েছে এমন কুণ্ডিও দেখা যায়।

জায়গা কম পাওয়া গেলে কুণ্ড ছোট হবে এবং আগৌর থাকবে কিছুটা উঁচুতে। আসলে কোনো পরিবার বা সমাজের কাজে লাগছে বলেই তো কুণ্ডের জন্য

জায়গার অভাব ঘটেছে। তাই এক্ষেত্রে চারপাশের ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন জমি থেকে ওই কুণ্ডের আগৌরকে আলাদা রাখাতে সেটিকে বারান্দার মতো উঁচু করে দেওয়া হয়।

চাষের জমি বড় হওয়ায় মরুভূমিতে গ্রাম এবং খেতের মধ্যে দূরত্ব পড়ে যায় অনেকটাই; তাই সারা দিন খেতে কাজ করতে হলে কাছা-কাছি জলের উৎস থাকাটা খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে ক্ষেতের মধ্যেই কিছু দূরে দূরে ছোট বড় কুণ্ডি তৈরি করা হয়।

বালুকাময় এলাকায় যেখানে ভৌমজল একশো-দুশো হাতেরও বেশি গভীরে, যা আবার বেশিরভাগই লবণাক্ত, সেখানেও দেখা যায় কুণ্ডি। আদ্দিগন্ত বালির ভিতর কুণ্ডি মাত্র কুড়ি-ত্রিশ হাত গভীর। এতে যে জল জমে, তা যদি চুঁইয়ে চুঁইয়ে বালিতে শুষে যেতে থাকে, তাহলে পরিপূর্ণ কুণ্ডি খালি হয়ে যেতে খুব একটা দেরি হবে না। তাই কুণ্ডের ভিতর জলনিরোধক পলেস্তরা হয় সর্বোত্তম। ছোট বড় সব কুণ্ডেই থাকে একশো ভাগ পলেস্তরা। এই কাজে টুকরো পাথর অথবা পাথরের পাটা সরাসরি ব্যবহার করা হয়। দুটো পাথর পর-পর বসানো হলে জোড়ের মাঝে যে সূক্ষ্ম ফাঁক থেকে যায়, তা মিহি চুনের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মরুভূমিতে ত্রিশ হাত গভীর কুণ্ডে পরিপূর্ণ জল রয়েছে, অথচ ত্রিশ ফোঁটা জলও বালিতে শুষে নেবে না, কোনো বড় বাস্তুকারই হয়তো এ রকম পোক্ত জলনিরোধক পলেস্তরার আশ্বাস নাও দিতে পারতে পারে, চেলওয়াজরা কিন্তু এই আশ্বাস দিয়ে থাকে!

যত সাবধানতার সঙ্গেই 'আগৌর' পরিষ্কার করা হোক না কেন, কিছুটা বালি শেষ পর্যন্ত কুণ্ডে গিয়ে পড়েই। এজন্য কখনো কখনো বছরের শুরুতে চৈত্রমাসে কুণ্ডের ভিতরে নেমে তা পরিষ্কার করতে হয়। নীচে নামার সুবিধা রাখতে তাই পলেস্তরা করার সময়েই কুণ্ডের বৃত্তাকার দেওয়ালে এক হাত অন্তর পাথরের ধাপ বসিয়ে দেওয়া থাকে।

কুণ্ডের মেঝেতে জমা হওয়া বালি যাতে সহজে তুলে আনা যায়, সে ব্যাপারেও থাকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা। মেঝেটি তৈরি হয় কড়াইয়ের মতো করে (যাতে সমস্ত বালি এসে কেন্দ্রে জমা হতে পারে)। এর নাম 'খামারিয়ো' বা 'কুণ্ডালিয়ো'। তবে ওপরে আগৌরে এত বেশি সাবধানতা বজায় রাখা হয় যে খামারিয়ো থেকে বালি তোলার কাজ দশ থেকে কুড়ি বছর পর এক আধবার করলেই চলে। একটি প্রজন্ম কুণ্ডকে এতটাই আগলে রাখে যে পরবর্তী প্রজন্মই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে সরকার কোথাও কোথাও জল সরবরাহের আধুনিক ব্যবস্থা করেছে। সেসব স্থানে আজ কুণ্ডিকে বাঁচিয়ে রাখার এই বিশাল ঐতিহ্য অনেকটাই কমে গেছে।

ব্যক্তিগত এবং সর্বজনীন, দুরকম কুণ্ডই দেখা যায়। ব্যক্তিগত হলে এগুলি ঘরের সামনে, উঠোনে, হাতায়, পিছনে ও বেড়ার পাশে থাকে। আর সর্বজনীন কুণ্ড সাধারণত পঞ্চায়েতের খাস জমিতে অথবা দুটো গ্রামের মাঝখানেই হয়। বড় কুণ্ডের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য দরজার ব্যবস্থা থাকে এবং সামনে সাধারণ দুটো চৌবাচ্চা রাখা হয়। একটা ছোট, অন্যটা বড়। একটা উঁচু একটা নিচু। 'খেল', 'থালা', 'হওয়াড়ো' কিংবা 'উবারা'— প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এদের ডাকা হয়। আশেপাশের ছাগল, ভেড়া, উঁট ও গরুর জন্য এখানে জল ভরে রাখা হয়।

সর্বজনীন কুণ্ড গ্রামের মানুষই তৈরি করে। জলের জন্য শ্রমদান পুণ্যের কাজ। কোনো পরিবার বিশেষ কোনো উপলক্ষ্যে প্রায়ই সর্বজনীন কুণ্ড নির্মাণের সংকল্প নেয়। তবে তা বাস্তবে রূপায়ণ করতে গ্রামের সব মানুষই সহযোগিতা করে। কখনো কখনো কোনো সম্পন্ন পরিবার সার্বজনীন কুণ্ড তৈরি করে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অন্য কোনো পরিবারের হাতে তুলে দেয়। কুণ্ডের বড় হাতার মধ্যে আগৌরের বাইরে এই পরিবারের থাকার ব্যবস্থাও করা হয়। এই ব্যবস্থা দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। কুণ্ড নির্মাতা সচ্ছল গৃহকর্তা সম্পত্তির একটা অংশ কুণ্ড দেখাশোনা করার জন্য আলাদা করে রেখে দেয়; এবংএই ব্যবস্থা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চলতে থাকে। এখনও রাজস্থানে এমন অনেক কুণ্ড আছে যেগুলো তৈরি করিয়েছে যে পরিবার, তারা হয়তো ব্যবসা অথবা চাকরির খাতিরে এখন আসাম, বাংলা বা মুম্বাইতে প্রবাসী, অথচ এগুলি দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল যে পরিবারের ওপর— তারা এখনও কুণ্ডতেই বসবাস করছে। এই বড় বড় কুণ্ডগুলি আজও বর্ষার জল সঞ্চয় করে রাখে এবং যে কোন পৌরসভার সরবরাহ করা জলের চেয়ে শুদ্ধ ও নির্মল জল সারা বছর জোগান দিয়ে যেতে সক্ষম।

মরুভূমিতে ত্রিশ হাত গভীর পরিপূর্ণ জল রয়েছে অথচ ত্রিশ ফোঁটা জলও বলিতে শুষে নেবে না - এ রকম আশ্বাস হয়ত কোনো বড় বাস্তুকারই নাও দিতে পারতে পারে, চেলওয়াজেরা কিন্তু এই আশ্বাস দিয়ে থাকে।

আজ কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা কুণ্ড দেখা যায়। অনেক জায়গায় জলও খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এসবই, সমাজে ভাঙনের সঙ্গে সমানুপাতিক হারেই হয়েছে। এতে পদ্ধতির নিজস্ব কোন ত্রুটি নেই। এমনকী শতাব্দীপ্রাচীন এই ব্যবস্থা তো বর্তমানের ব্যয়সাপেক্ষ আর কাণ্ডজ্ঞানহীন পরিকল্পনাগুলোর ভুল-ত্রুটিও ঢেকে দেবার ক্ষমতা রাখে। কিছুদিন আগে এই এলাকাগুলিতে জলসমস্যার সমাধানকল্পে

অনেকগুলো নলকূপ আর হ্যান্ডপাম্প বসানো হয়। কিন্তু দেখা গেল সবগুলোর জলই লবণাক্ত। মিষ্টি পানীয় জল এখনও একমাত্র এই কুণ্ডগুলিতেই পাওয়া সম্ভব। অতএব পরে যখন বুদ্ধি এল, তখন এই কুণ্ডিগুলোর ওপরেই হ্যান্ডপাম্প বসিয়ে দেওয়া হয়। বহুল প্রচারিত ইন্দিরা গান্ধী নহর থেকে এসব অঞ্চলে কোথাও কোথাও পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে সরকারি ট্যাংকে জল সংগ্রহ করা হল, এবং কিছু ক্ষেত্রে পুরোনো কুণ্ডগুলোকেও এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই কুণ্ডগুলি অতীত কালের, আবার বর্তমান সময়কেও এরা প্রত্যক্ষ করছে। সেই হিসেবে এগুলি সময়সিদ্ধ। এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এগুলি তৈরি করতে কখনই অন্য কোন জায়গা থেকে নির্মাণসামগ্রী আমদানি করে আনতে হয়নি। মরুভূমিতে জল সংরক্ষণে যে সুবিশাল ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে, তার সবচেয়ে বড় গুণ হল— যেখানে যে উপকরণ পাওয়া যায়, সেখানে তা দিয়েই মজবুত পরিকাঠামো তৈরি করার স্থিতিস্থাপক মানসিকতা। কোনো জায়গায় হয়তো বিশেষ একটা উপকরণ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যত্র সেটা নেই - তবুও, সেখানেও কুণ্ড তৈরি হবে।

যেখানে পাথরের পাটা পাওয়া যায়, সেখানে কুণ্ডের প্রধান অংশ তৈরি হয় পাথরের পাটা দিয়েই। কোথাও হয়ত পাথর নেই কিন্তু সেখানে 'ফোগ' নামের এক ধরনের গাছ আছে, সহযোগিতা পাওয়া যায় ফোগ গাছের। এই গাছের ডালগুলিকে একটা অন্যটার সঙ্গে গেঁথে, ফাঁস লাগিয়ে কুণ্ডের ওপর গম্বুজাকৃতি ঢাকনার কাঠামোটি তৈরী করা হয়। এর ওপর থাকে বালি, মাটি ও চুনের মোটা প্রলেপ। গম্বুজের ওপরে ওঠার জন্য ভেতরে গাঁথা কাঠের কিছু অংশ বাইরে বের করে রাখা হয়। মাঝখানে জল তোলার জায়গা। বর্ষার জল কুণ্ডের চারপাশে সেই 'আয়রো' নামের ছিদ্র দিয়েই ভেতরে যায়; কিন্তু পাথরের তৈরি কুণ্ডের গায়ে যেমন একাধিক ছিদ্র থাকে, ফোগ কাঠের কুণ্ডতে তা থাকে না। সেখানে ছিদ্র সবসময় একটি। কুণ্ডের ব্যাস হয় সাধারণত সাত-আট হাত এবং উচ্চতা প্রায় চার হাত। আর যে ছিদ্র দিয়ে জল কুণ্ডে প্রবেশ করে তা এক বিত্তা। বর্ষার জল কুণ্ডতে সঞ্চিত হওয়ার পর এই ছিদ্রটি কাপড়ে জড়ানো একটি খিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফোগ গাছের কুণ্ডগুলো আলাদা আলাদা আগৌরের বদলে একটাই বড় আগৌরের ভেতরে নির্মাণ করার চল আছে। অনেকটা 'কুঁই'-এর ধরনের। আগৌরের পাশে লেপা-পোঁছা ঘর আর সেই রকমই পরিচ্ছন্ন কুণ্ডগুলো চারপাশে ছড়ানো সীমাহীন মরুভূমির ভেতরে যেন পরস্পরের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে।

রাজস্থানের মানুষের রঙের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। জীবনের সুখ-দুঃখের ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে লেহেঙ্গা, ওড়না আর জমকালো রঙের পাগড়িগুলোও রঙ পালটায়। কুণ্ডগুলো কিন্তু শুধু সাদা রঙেই রাঙানো হয়। এখানে প্রখর রোদ আর গরমও প্রচণ্ড; কুণ্ডগুলিতে যদি কোনো গাঢ় রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহলে তা বাইরের উত্তাপ শুষে নিয়ে ভেতরের সঞ্চিত জলকেও প্রভাবিত করবে। তাই এখানকার রঙিন সমাজও কুণ্ডগুলিতে সাদা ছাড়া আর কোনো রঙ চাপায় না। সাদা রঙ রৌদ্রকে প্রতিফলিত করে। ফোগ-কাঠ দিয়ে তৈরি গম্বুজও রৌদ্রে গরম হয় না, সহজে ফেটেও যায় না, ভেতরে জলও অনায়াসে ঠাণ্ডা থাকে।

কিছুদিন আগে সরকারি কোন এক বিভাগ কোন এক নতুন পরিকল্পনা অনুসারে এ এলাকায় ফোগের তৈরি কুণ্ডগুলোর ওপর কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। গম্বুজ তৈরিতে ফোগের বদলে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়। যারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তারা হয়তো ভেবেছিল তাদের তৈরী নতুন কুণ্ডগুলি বেশি মজবুত হবে। কিন্তু সেরকম হল না। সিমেন্টের গম্বুজ এখানকার প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে না পেরে কুণ্ডের ভেতরেই ভেঙে পড়ে। নতুন কুণ্ডগুলিতে ভেতরের দেয়ালে পলেস্তরা দেওয়ার কাজও চুন-সুরকির বদলে সিমেন্ট দিয়ে করা হয়েছিল। তাই সেখানেও দেখা দিল অসংখ্য ফাটল। এই ফাটল ভরাট করতে আলকাতরা ব্যবহার করা হল। মরুভূমির উত্তাপে সেই আলকাতরাও গলে গেল; বর্ষার সঞ্চিত জল ফাটল পথে বালির ভেতর চলে গেল। শেষমেষ সেখানকার মানুষ আবার ফোগ ও চুন-সুরকি দিয়ে সেই 'স্বয়ংসিদ্ধ' কুণ্ড তৈরি করে নিতে বাধ্য হয়। আধুনিক উপকরণ যে জল সংকট ডেকে এনেছিল, তার সমাধান এইভাবেই হল।

মরুভূমিতে কোথাও কোথাও খড়িয়া পাথরের স্তর মাটির অনেক কাছে, অর্থাৎ মাত্র চার-পাঁচ হাত নীচেই পাওয়া যায়। তখন সেখানে কুঁই হওয়া সম্ভব নয়। 'রেজানি' জলের ভাণ্ডার থাকলে তবেই 'কুঁই'তে জল জমে। কিন্তু খড়িয়া পাথর যদি কম গভীরতাতেই মেলে, তাহলে তাতে সারা বছর ধরে কলসি ভরানোর মতো জল পাওয়া যাবে না। তাই এসব এলাকায় কুণ্ড তৈরিতে ওই খড়িয়া পাথর ব্যবহার করা হয়। পাথরের বড় বড় চাঁই খাদান থেকে ভেঙে এনে কাঠের আগুনে পোড়ালে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তা ফেটে গিয়ে ছোট ছোট টুকরো হয়ে যায়। এরপর টুকরোগুলোকে গুঁড়ো করা হয়। আগৌর নির্বাচন করে কুণ্ড খোঁড়ার পর ভেতরের পলেস্তরা ও গম্বুজ বানাতে এই গুঁড়ো ব্যবহার করা হয়। পাঁচ ছয় হাত ব্যাসওয়ালা কুণ্ডের গম্বুজগুলো পুরু থাকে এক বিত্তা। এর ওপর দুজন মহিলাও যদি দাঁড়িয়ে জল তোলে, তাহলেও গম্বুজ ভাঙবে না।

মরুভূমিতে কোথাও কোথাও লম্বা পাথরের চাটান চলে গেছে। এই চাটান থেকেও প্রয়োজনীয় পাথর পাওয়া সম্ভব। এ পাথর দিয়ে বিশাল বিশাল কুণ্ড তৈরি হয়। চাটান থেকে পাওয়া পাথরের পাটাগুলো যথেষ্ঠ বড় বড়। প্রায় দু-হাত চওড়া আর লম্বাতেও প্রায় চোদ্দোহাত। তাই যত বড় আগোরই হোক আর যত বেশি জলই কুণ্ডে জমা হোক, এই পাটা দিয়ে ঢেকে তত বড় কুণ্ডই বানিয়ে তোলা সম্ভব। ঘর ছোটই হোক বা বড়, কাঁচাই হোক কী পাকা— কুণ্ড কিন্তু তৈরি হবে পাকাপাকিভাবেই। মরুভূমির গ্রামগুলি পরস্পরের থেকে অনেক দূরে। জনসংখ্যাও কম। এরকম ছড়িয়ে থাকা গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। তাই এখানকার সমাজ জলসংক্রান্ত সমস্ত উদ্যোগ যতটা সম্ভব বিকেন্দ্রিকরণ করে সে দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে যেন বিন্দু বিন্দু করে ভাগ করে নিয়েছে। ফলে পুরো বিষয়টা নীরস অথবা যান্ত্রিক একটা অভ্যাস না হয়ে সামগ্রিক এক চেতনায় পরিণত হয়েছে। জয়সলমেরের গ্রামগুলিতে গেলে বোঝা যাবে এই কুণ্ডগুলিকে কত সুন্দর করে তোলা সম্ভব।

এক একটা গ্রামে বড়জোর পনেরো থেকে কুড়িটা পরিবারের বাস। বর্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এমনকী জয়সলমের অঞ্চলের গড় বৃষ্টির থেকেও এখানকার বর্ষণের পরিমাণ কম। এখানে দেখা যায় প্রতিটা ঘরের সামনে বড় মতো একটা বারান্দা তৈরি করা হয়েছে। বারান্দার ওপরে এবং নীচের দেওয়ালে রামরজ, হলুদ ও গিরিমাটি দিয়ে সুন্দর আলপনা করা, যেন একটা রঙিন গালিচা বিছানো রয়েছে। বারান্দার ওপরেই গৃহস্থালির প্রতিদিনের সমস্ত কাজ। আনাজপাতি শুকোনো, বাচ্চাদের খেলা, সন্ধ্যায় বড়দের মজলিস বসে, আর ঘরে অতিথি এলে, রাত্রে তার শোয়ার ব্যবস্থাও এই বারান্দার ওপরেই। এটা কিন্তু শুধুই একটা বারান্দা নয়; একটা কুণ্ডও। ঘরের ছাত, উঠোন এমনকী সামনের ছোট মাঠের ওপর বর্ষিত সমস্ত জল এই কুণ্ডতে জমা হয়। কোনো বছর যদি বর্ষার জলে কুণ্ড না ভরে? কুণ্ড কিন্তু ভরিয়ে নিতেই হবে নাহলে সার বছর চলবে কিভাবে! তাই উটের গাড়ি করে কোনো কুয়ো বা পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে এটি ভরিয়ে নেওয়া হয়।

কুণ্ডি-কুণ্ডর মতোই হল 'টাঁকা'গুলি। এতে সাধারণত উঠোনের বদলে বাড়ির ছাতে বর্ষিত জল সংগ্রহ করা হয়। যে বাড়ির ছাত যত বড়, অনুপাতিক হারে সেই বাড়ির তত বড় 'টাঁকা'। অবশ্য পরিবারের সদস্যসংখ্যা ও তাদের জলের প্রয়োজনীয়তার ওপরও নির্ভর করে টাঁকার আয়তন। মরুভূমিতে গ্রাম ও শহরের বাড়িগুলির ছাদ সবসময় হালকা ঢাল রেখে তৈরি হয়, যাতে বর্ষার সমস্ত জল গড়িয়ে এসে টাঁকাতে

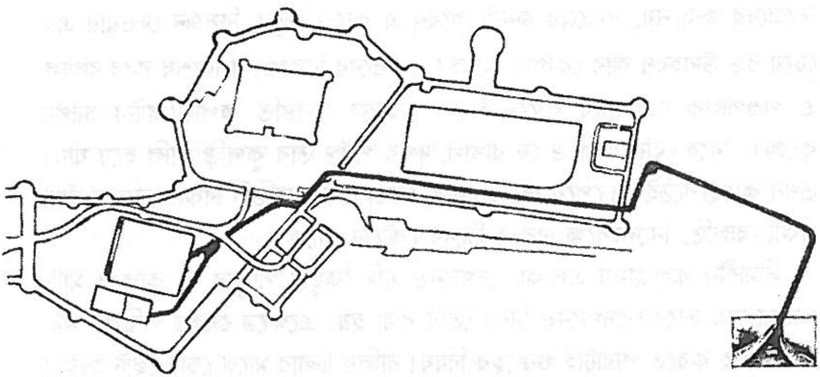

জমা হতে পারে। ঢালের মুখের দিকে থাকে একটি পরিষ্কার নালি। এতে জলের সঙ্গে বয়ে আসা ময়লা আটকানোরও ব্যবস্থা করা থাকে। ফলে পরিষ্কার ছাঁকা জল নীচের টাঁকায় গিয়ে জমা হয়। দশ-বারো জন সদস্যের একটি পরিবারের 'টাঁকা' প্রায় পনেরো-কুড়ি হাত গভীর এবং প্রায় ততটাই লম্বা চওড়া হয়।

এই টাঁকা কোনো ঘর, বৈঠকখানা অথবা উঠোনের নীচে থাকে। এটি পাকাপাকিভাবে ঢাকা থাকে। এক কোণে থাকে টাঁকার মুখ এবং তাতে কাঠের পরিষ্কার ঢাকনা লাগানো। এই জলেই সারা বছর খাওয়া ও রান্নার কাজ চলে। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ছাতে কেউ জুতো বা চটি পরে ওঠে না। গরমকালে ঘরের লোকজন অবশ্যই ছাতে শোয় কিন্তু অবোধ শিশুদের এমন একটা জায়গায় শোয়ানো হয়, যে অংশটা টাঁকার সঙ্গে যুক্ত নয়। কেননা তারা রাত্রে বিছানা ভিজিয়ে ফেলতে পারে আর তাতে ছাদের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হবে।

প্রাথমিক সাবধানতা এটাই যে ছাত, নালা ও তার সঙ্গে যুক্ত টাঁকা যেন সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে। তবুও কয়েক বছর অন্তর গরমের দিনে অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে যখন টাঁকায় সব থেকে জল কম, তখন ভেতরে ঢুকে সেটি ধোয়া মোছা করা হয়। ভেতরে নামার জন্য ছোট ছোট সিঁড়ি এবং মেঝেতে সেইরকমই কড়াইয়ের মতো ঢালু 'খামাড়িয়ো' থাকে, যাতে ভেতরে চলে যাওয়া ময়লা সহজে সংগ্রহ করা যায়। কোথাও কোথাও ছাত ছাড়াও ঘরের সামনের বড় উঠোনের সঙ্গে টাঁকার সংযোগ থাকে। তখন এর জল সংগ্রহের ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে যায়। যদিও এসব টাঁকা

ব্যক্তিগত, তবু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখলে পুরো পাড়াই এর সামনে জড়ো হয়। ব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিকে মিশে যায়।

পাড়া, গ্রাম আথবা শহর ছাড়াও সুদূর নির্জনেও টাঁকা তৈরি হয়। নির্মাতারা নিজেদের জন্য নয়, সমাজের জন্যই করেন এ কাজ। প্রভুত্ব বিসর্জন দেওয়ার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কোথায় আছে! এ ধরনের টাঁকাগুলো বিশেষ করে বাগাল ও পশুপালক ছেলেদের কাজে লাগে। সকালে জলভর্তি কুপড়ি(মাটির চ্যাপ্টা কুঁজো) নিয়ে বেরিয়ে পড়ে যে রাখাল, দুপুর পর্যন্ত তার কুপড়ি খালি হয়ে যায়। তখন কাছেপিঠেই সে পেয়ে যায় এরকম একটা টাঁকা। প্রতিটি টাঁকায় দড়িতে বাঁধা একটি বালতি, নিদেনপক্ষে একটা টিনের কৌটো থাকে।

সীমাহীন বালুকাময় এলাকা, সেখানেও যদি কিছুটা পাথুরে বা কাঁকুরে মাটি পাওয়া যায় তাহলে সেখানেও টাঁকা তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে জলের পরিমাণ নয়, জল সংগ্রহ করতে পারাটাই গুরুত্বের বিষয়। বালির টিলার মাঝে ছোট ছোট জায়গা দেখা যায়, যেখানে অল্প হলেও বর্ষার জল জমে থাকে। এগুলোকে 'চররো' বলে। চররো-তে জমে থাকা জলও টাঁকায় ভরে নেওয়া হয়। এই রকম টাঁকার পাশে-পাশে আল দিয়েও জল সংগ্রহ কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া হয়।

আধুনিক হিসেব অনুযায়ী, অতি ছোট কুণ্ডি বা টাঁকাতেও প্রায় দশ হাজার লিটার ও মাঝারিগুলোতে পঞ্চাশ হাজার লিটার জল জমা করা সম্ভব। বড় আকারের টাঁকাগুলি হল 'লাখপতি'। এক-লক্ষ, দু-লক্ষ লিটার জল এতে ধরা থাকে। অবশ্য সবচেয়ে বড় টাঁকা কে কোটিপতিই বলুন। এতে ষাট লক্ষ গ্যালন অর্থাৎ প্রায় তিন কোটি লিটার জল ধরে। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে জয়পুরের কাছে জয়গড় দুর্গে এটি তৈরি হয়েছিল। একশো পঞ্চাশ হাত লম্বা এবং চওড়া ও চল্লিশ হাত গভীর এই বিশাল টাঁকাটির প্রশস্ত ছাত ভেতরে জলে ডুবে থাকা একাশিটি থামের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর ভেতরে আলো হাওয়া ঢোকার জন্য চারপাশে রয়েছে জানালার ব্যবস্থা। ফলে জল সারা বছর টাটকা এবং পরিষ্কার থাকে। ভেতরে ঢোকার জন্য টাঁকার দুই প্রান্তে দুটো দরজা। এদের একটা গলি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং দুদিক থেকেই নীচে জলের কাছে যাওয়ার জন্য রয়েছে সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁকে করে জল ওপরে তুলে আনা হয়। বাইরের জানালা থেকে কারো ছায়া যখন স্তম্ভের মাঝে দিয়ে গিয়ে জলের ওপর পড়ে, তখন বোঝা যায় যে জল কতটা নীলাভ।

এই নীল জল দুর্গ বা গড়ের আশপাশের পাহাড়ের ছোট ছোট নালা দিয়ে

একটা বড় নালায় এসে পড়ে। রাস্তার মতো চওড়া এই পরিখা দুর্গের সুরক্ষা পুরোপুরি বজায় রেখেই গড়ের দেওয়ালের তলা দিয়ে ভেতরে পৌঁছেছে।

বর্ষার আগে নালাগুলো পরিষ্কার তো করা হয়ই, তাছাড়াও বর্ষার প্রথম জল টাঁকার ভেতরে ঢোকানো হয় না। প্রধান টাঁকা ছাড়াও আরও দুটো টাঁকা আছে। একটা খোলা, অন্যটা বন্ধ। এদের সামনে এসে বড় নালার মুখে ফটক লাগানো হয়েছে। এই ফটক খোলা বা বন্ধ করা যায়। প্রথমে প্রধান টাঁকার দিকে বয়ে-চলা নালার ফটক বন্ধ করে দিয়ে খোলা টাঁকার পথ উন্মুক্ত করা হয়। প্রথম দফার জল নালাগুলিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে খোলা টাঁকায় গিয়ে পড়ে। এর পর তার সঙ্গে সংলগ্ন বন্ধ টাঁকায়। এ-দুটির জল কাজে লাগত পশুদের। জয়গড় ছিল-পুরোদস্তুর এক দুর্গ এবং কোন একসময় গোটা একটা সৈন্যবাহিনীই এখানে থাকাত। সেই ফৌজের হাতি, ঘোড়া, উট সকলের জন্যই জন্য প্রতিদিন প্রচুর জল প্রয়োজন। এছাড়া অত বড় দুর্গ পরিষ্কার করার জলও নেওয়া হত ঐ দুটো টাঁকা থেকেই। যখন জল আসার সব রাস্তা, সব নালাগুলো ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল তখন প্রথম ফটক বন্ধ হত এবং প্রধান টাঁকার ফটক খুলে যেত। এই বিশাল টাঁকা তখন তিন কোটি লিটার জল ধারণ করার জন্য প্রস্তুত। এত বড় টাঁকা তৈরি করার পরিকল্পনার পেছনে অবশ্য শুধুই প্রয়োজন নয়, দুর্গের সুরক্ষার বিষয়টিও ছিল। শত্রুরা যদি কখনো দুর্গ অবরোধ করে, তাহলে দীর্ঘ সময় যেন ভেতরে জলের অভাব না হয়।

রাজা গেছেন, তার ফৌজও আর নেই। এখন জয়পুর বেড়াতে আসে যেসব পর্যটক, তারা এখানে ঘুরতে আসে। খাড়া ঢাল বেয়ে উঠে যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন এই টাঁকার শীতল নির্মল জল তাদের ক্লান্তি দূর করে।

টাঁকা ও কুণ্ডিতে স্থির হয়ে থাকা জলও যে এত নির্মল হতে, পারে তা বোধহয় সারা দেশে বয়ে চলা বাগধারাও আন্দাজ করতে পারে না।

বিন্দুতে সিন্ধু

ভক্তিস্নাত হয়ে ঋষি-কবিরা বলেছেন, 'বিন্দুতেই সিন্ধু'। ঘর-সংসারে ডুবে থাকা গৃহস্থ মানুষ প্রথমে হৃদয়ে এবং তারপর নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে এমনভাবে এই কথাটিকে বিকশিত করেছে, দেখে বিস্ময়ের অবধি থাকে না!

'পালর পানি' অর্থাৎ বর্ষার জলকে বরুণদেবতার আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করা এবং এক বিন্দু, এক কণাও নষ্ট হতে না দেওয়া— এই মানসিকতায় যে শ্রদ্ধা; তা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক, অন্যদিকে নিপাট সাংসারি। অবশ্য এছাড়া বিশাল মরুভূমিতে জীবন কীভাবেই বা সম্ভব?

'পুর' শব্দটি সব জায়গাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু 'কাপুর' শব্দটি সম্ভবত শুধু রাজস্থানেই রয়েছে— অর্থ বুনিয়াদি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত গ্রাম। শব্দ ভাণ্ডারে শব্দটি মজুত থাকলেও, কোনো গ্রামকে যাতে কাপুর বলতে না পারা যায়, তার ব্যবস্থাও রাজস্থানের মানুষ যথাসম্ভব করেছে।

বঁধ-বধাঁ, তাল-তলাই, জোহড়-জোহড়ি, নাড়ি, তালাব, সরোবর, সর, ঝিল, দেইবাঁধজগহ, ডহরি, খড়িন এবং ভে— এই সবকটিকেই বিন্দু বিন্দু করে ভরিয়ে যেন সিন্ধু সম করে তোলা হয়েছে। আজ আধুনিক সমাজ জল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যে স্থানটিকে ভেবেছে সমাধানের অতীত, পুরোন সমাজ সেই স্থানেই কোথায় কী কী করা সম্ভব— এই মানসিকতা থেকে কাজ করেছে। প্রভু 'এত দিয়ো', এই প্রার্থনার বদলে 'যতটা দাও'[১] তাতেই প্রয়োজন মিটিয়ে নেব— এমন দাবি করা বোধহয় তাদের পক্ষেই স্বাভবিক।

মাটি ও আকাশের রূপ যেভাবে পাল্টায়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুকুরের চেহারা, আয়তন এবং নামও পাল্টে যেতে থাকে। চারিদিকে যদি কঠিন পাহাড় থাকে এবং বর্ষাও ভাল হয়, তাহলে সারা বছরের জন্যই শুধু নয়, বছরের পর বছর জল থাকবে— সে রকম বড় বড় ঝিল ও পুকুর তৈরি করা হয়েছে। সুবৃহৎ এই কাজগুলি শুধু যে রাজপরিবারের উদ্যোগেই তৈরি হয়েছিল— এমন নয়। অনেক

বিশাল আকৃতির পুকুর ও ঝিল-ই ভিল, বান্‌জারা, পশুপালক সম্প্রদায়ের মানুষেরা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে তৈরি করেছে।

অনেক ইতিহাসবিদ্, যারা ইতিহাসবিদ হিসেবে নামী এবং যথেষ্ট দামীও তারা অনেকেই এই বৃহৎ কাজগুলিকে বেগার প্রথার সঙ্গে সংলগ্ন বলে দেখিয়েছেন। কিন্তু অপবাদ তো নিয়ম হতে পারে না। এর মধ্যে কিছু কাজ হয়েছে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষের সাহায্যার্থে— তাদের কাছে আনাজপাতি পৌঁছে দেবার জন্য; আর কিছু কাজ হয়, ভবিষ্যতে যদি আসে সেই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য। তাছাড়াও আরও কিছু কাজ হয়েছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়।

যদি বয়ে আসা জল কম পাওয়া যায় এবং তা সংগ্রহ করে রাখার জায়গাও থাকে কম, তাহলেও কিন্তু সেই জায়গাটুকুও ছেড়ে দেওয়া হয় না। এখানে পুকুর পরিবারের সব থেকে ছোট সদস্যটির দেখা পাওয়া যাবে। তার নাম 'নাড়ি'। বালির ছোট পহাড় অথবা ছোট আগৌর থেকে বয়ে আসা সামান্য পরিমাণ জলও তার কাছে যথেষ্ট সম্মান পায়। নাড়ি অল্প একটু বয়ে আসা জলও নষ্ট হতে দেয় না। নাড়ির নির্মাণ উপকরণগুলি সাধারণত কাঁচা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তার স্বভাব চরিত্রও সে রকম। এসব জায়গায় দুশো-চারশো বছরের পুরোনো নাড়িও পাওয়া যাবে। এতে এক-দেড়মাস থেকে সাত-আটমাস পর্যন্ত জল থাকে। খুব ছোট গ্রামেও একাধিক নাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। বিস্তৃত মরুভূমির মাঝের গ্রামগুলিতে, গ্রাম পিছু দশ-বারোটি করে নাড়ি রয়ছে। জয়সলমেরে পালিওয়ালদের ঐতিহাসিক চৌরাসি গ্রামে সাতশোরও বেশি নাড়ি তৈরি হয়েছিল। আজও নাড়িগুলি অথবা যেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেগুলি যে ছিলো তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

তলাই বা জোহড়-জোহড়িতে নাড়ির থেকে কিছুদিন বেশি জল থাকে। জলের পরিমাণও তুলনামূলক ভাবে বেশি। এগুলিতে পাথর বাঁধানো ছোট ঘাট, জলে নামার জন্য পাঁচ-সাতটা সিঁড়ি সহ মহলের মতো ছোট ইমারতও পাওয়া যেতে পারে।

আর কিছুই যেখানে হওয়া সম্ভব নয়— সেখানেও পাওয়া যায় তলাই। রাজস্থানের যেখানে যেখানে লবণাক্ত হ্রদ রয়েছে, সেখানে আশেপাশে বিস্তৃত এলাকার সমস্ত জমিই নোনতা। এখানে বৃষ্টির জল মাটিতে পড়া মাত্র লবণাক্ত হয়ে যায়। 'পাতালপানি' অর্থাৎ ভৌমজল, মাটির ওপরে বইতে থাকা 'পালরপানি' অর্থাৎ বর্ষার জল এবং এই দুইয়ের মাঝে থাকা 'রেজানি পানি' অর্থাৎ খড়িয়া পাথরের স্তরে আটকে পড়া জল— সবই নোনতা। এখানে যে নলকূপ ও হ্যান্ডপাম্পগুলি বসানো হয়েছে— তাতেও নোনা জলই উঠছে। অথচ এই জায়গাতেই চার-পাঁচশো বছরের পুরোনো এমন তলাই

পাওয়া যায়, যা সারা বছর ধরে মিষ্টি জল দেয়। এগুলির আগৌর লবণাক্ত জমি থেকে দু-চার হাত উঁচুতে উঠিয়ে তৈরি করা এবং এই আগৌর থেকেই বৃষ্টির মিষ্টি জল তলাইগুলিতে সংগ্রহ করে নেওয়া হয়।

এ রকম অধিকাংশ তলাই-ই প্রায় চারশো বছরের পুরোনো। সে সময়টায় নুনের সমস্ত কাজ করত বাঞ্জারা সম্প্রদায়। তারা হাজার হাজার পশুর পাল নিয়ে নুনের কারবারে এই অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াত করত। রাস্তায় যে গ্রাম পড়ত তার বাইরের জমিতে তারা তাঁবু ফেলত। তাদের নিজেদের জন্য তো বটেই, পশুদের জন্যও জলের প্রয়োজন ছিল। বান্‌জারারা খুব ভালোভাবে বুঝেছিল যে, নুনের স্বভাবই হচ্ছে জলের সঙ্গে গুলে যাওয়া। তারা জলের স্বভাবও জানত। জলও খুব দ্রুত নুনকে নিজের মধ্যে একাত্ম করে নেয়। কিন্তু দুইয়ের একাত্ম হওয়ার এই স্বভাব তারা কীরকম চাতুর্যের সঙ্গে আলাদা করতে জানত, তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সম্বর হ্রদের সুবিশাল লবণাক্ত আগৌরের ভেতর কিছুটা ওপরে উঠিয়ে তৈরা করা বিভিন্ন তলাই।

বিংশ শতাব্দীতে যে যে সরকার এসেছে এবং একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নিয়ে চলেছে যে সরকারী প্রশাসন— তাদের কেউই এই লবণাক্ত এলাকার গ্রামগুলির জন্য পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা করতে পারেনি। কিন্তু বাঞ্জারারা তো এই গ্রামের নুন খেয়েছিল, তাই তারাই এই গ্রামগুলিকে মিষ্টি জল খাইয়েছে। কয়েক বছর আগে নতুন কিংবা পুরোনো সরকারী প্রশাসনও বাঞ্জারাদের তলাইগুলির কাছাকাছি ঠিক একই রকম তলাই নির্মাণের চেষ্টা করে, কিন্তু নুন ও জলের একাত্ম হয়ে যাওয়ার যে স্বভাব— তাকে তারা আলাদা করতে পারেনি।

জল যদি বেশি পাওয়া যায় এবং তা সংগ্রহ করে রাখার জায়গাও কিছুটা বেশি পাওয়া যায়, তাহলে আর এক ধাপ এগিয়ে তৈরি হবে 'তালাব' অর্থাৎ পুকুর। এতে বর্ষার জল আগামী বর্ষা পর্যন্ত ধরা থাকে। গতিশীল আধুনিক সভ্যতার অবদানে পুরোনো কিছু পুকুর অবশ্যই নষ্ট হয়েছে, তবুও সারা বছর পরিপূর্ণ থাকে এমন পুকুরের সংখ্যা আজও এখানে কম নয়। জনগণনার তথ্য সংগ্রহ করতে এসে সরকারী লোকেরা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে না যে এখানে এত পুকুর রয়েছে। কারা এত পুকুর তৈরি করেছিল— সরকারী রিপোর্টে সে কথাটা পর্যন্ত উল্লেখ করতে ভয় পায় এই সব সরকারী লোকেরা! এখানে সমস্ত পরিকাঠামোই আসলে সমাজ তার আপন শক্তিতে গড়ে তুলেছিল। এ কাঠামো এতটাই মজবুত যে উপেক্ষা-অবহেলার দীর্ঘ সময় পার করে এসে আজও তা টিকে রয়েছে এবং